পাহাড়ি ডার্জ

মৃণাল চক্রবর্তী

প্রমা

প্রমা প্রকাশনী

৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ। কলকাতা-১৭

৫৭/২ই, কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-৭৩

প্রথম পরিচয়

প্রদীপের চিঠি—শুভ্রকে

শুভ্র,

এই নিয়ে পাঁচটা চিঠি লিখছি তোকে। শুনেছি কয়েকমাস হল তুই ফিরে এসেছিস ফ্রান্স থেকে। চিঠিগুলো পেয়েছিস আশা করি। উত্তর দিসনি। আমি তো এলেবেলে—আত্মসম্মানজ্ঞানহীন। এমনকী আমার মতো লোকের পক্ষেও ব্যাপারটা আর সহ্য করা যাচ্ছে না। এই শেষ চিঠি। তুই উত্তর না দিলে আর লিখব না।

কী ভাবছিস? আমার সেই চিরকালীন 'অভিমান'—তাই না? তাই হবে হয়ত। তোরা সবাই দূরে দূরে আছিস। একা আমিই প্রচুর স্মৃতির বোঝা নিয়ে ইউনিভার্সিটির চারপাশে ঘুরে বেড়াই। দু-একবার ঢুকে পড়ার ইচ্ছেও হয়েছে। কিন্তু সব নতুন ছেলেমেয়েদের ভিড়। নতুন মুখ সব। আমাদের পরিচিত শেষ ছেলে বা মেয়েটিও এখানে আর নেই এখন। খালি আছে বাদলদা। আমাদের বুড়ো বেয়ারা বাদলদা, যাকে ইউনিভার্সিটিতে প্রথম ঢুকে তুই তোর সেজমামা ভেবেছিলি। বোধহয় ভুলেও গেছিস।

নাকি এটা সেই বাংলা সিনেমার গল্পের মতো? এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু খুব প্রতিষ্ঠা পেয়ে সাধারণ সব মুখগুলোকে মুছে ফেলতে চাইছে—ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে সম্পর্কগুলো? এটা কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। বিশেষত 'প্রতিষ্ঠিত' বন্ধুটি যেখানে তুই। এতটা সাধারণ হয়ে গেছিস এখনও ভাবছি না। তবে ভাবব—এই চিঠিরও উত্তর না পেলে।

আমার স্কুলে বছরে নিয়মমাফিক এবং নিয়মবহির্ভূত হাজারটা ছুটি। আমার কোনো দায়িত্ব নেই, কর্তব্য নেই, মা-বাবা-বউ কেউ নেই। তাই আমার হাতে সবসময়ই অনেক সময়। বই পড়ে আর কতটুকু সময় কাটে? মাঝে-মধ্যে বেড়াতে যাই কোথাও—আগের মতোই। কিন্তু সেখানেও কি

রেহাই আছে? বারবার মনে হয়, এই বুঝি তোরা কেউ আমার সেণ্ট্রাল রোডের একতলার ছোটো ঘরটায় নক্ করে ফিরে গেলি। মনে হয়, তোরা বুঝি এখনও চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছিস ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে। তাই এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই স্মৃতিতাড়িত আমি ফিরে আসি। ফিরে এসে আবার যে কে সেই। ভাবছি এবার একটা বিয়ে করব। সিরিয়াসলি নিস না। ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

তোরা আমায় অনেককিছু দিয়েছিস। তোদের সঙ্গ দিয়ে, আড্ডা, গালাগালে আমার মরচে-পড়া গ্রাম্য খোলসটা ভেঙে একেবারে তোদের মতো করে নিয়েছিলি। এখন আমার অন্য সঙ্গ ভালো লাগে না। সবচেয়ে বুদ্ধিমান সহকর্মীকেও মনে হয় খুব সাধারণ—জোলো। আমি কী করব বলতে পারিস?

মনে আছে, তোকে আমরা রোবট বলতাম? সেটা, তুই জানিস, শুধু তোর মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্যে নয়। পরীক্ষার আগে আগেই তোর একগুঁয়েমির জন্যে। তোদের লেক গার্ডেন্সের বাড়ির দরজা প্রায় সব-সময়েই বন্ধ থাকত তোর পরীক্ষার আগে। তুই পড়তি। আমরা কেউ গেলেই গম্ভীর মুখে বলতি—"আয়। আমি পড়ছিলাম"। আমরাও কি কম বদমাস ছিলাম? কিছুতেই উঠতাম না। তুই একটু পরেই সিগারেটের প্যাকেট বা বিড়ির বাণ্ডিল বের করে দিয়ে ততোধিক গম্ভীর মুখে পড়ার টেবিলে ফিরে যেতি। আমরা তোর খাটে শুয়ে সিগারেট খেতে খেতে তোকে দেখে প্রথমে মুচকি মুচকি হাসতাম—তারপরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তাম। কারণ ছিল। তুই যখন পড়ায় ডুবে যেতি তখন তোর ঠোঁট নড়ত, বিড়বিড় শব্দ হত। কখনও বা হাসতি অল্প অল্প। কিছু একটা মিলে গেলেই চেঁচিয়ে উঠতি, "পেয়েছি শালাকে!" আর না মিললে "ধুস্-শালা!" বলে দাঁত দিয়ে নখ কাটতি। আর আমরা যখন তোর এ-সব বিচিত্র ভঙ্গি দেখে হাসিতে ফেটে পড়তাম তখন বলতি—"দাঁড়াও শুয়োরের ছানারা, তোমাদের ফাইনাল আসুক, তখন আমিও গিয়ে এরকম দিল্লাগি করব"। কিন্তু বেচারা! তুই সে সুযোগ কোনোদিনও পাসনি। যখনই আমাদের বি. এ. বা এম. এ. ফাইনাল চলছে, তখন তোরও কোনো না কোনো পরীক্ষা লেগে আছে।

আবার এই তুইই অন্তসর্বস্ব 'ডিবেট' করতি। এরকম একটা ডিবেটেই আমাদের প্রথম আলাপ হয়—মনে আছে? তোর ঝলমলে কথার পাশে আমি

নিতান্তই পানসে মেরে যেতাম প্রথম দিকে। তবে পরে আমিও তোকে বেশ মেরেছি কয়েকবার। কীরে, মনে আছে—সেই যে একবার প্রেসিডেন্সিতে ডিবেট হল? ইউনিভার্সিটি থেকে তুই আর আমি গিয়েছিলাম। টপিকটা আমার মনে নেই। তবে মনে আছে যে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম আর তুই থার্ড। সেকেণ্ড কে হয়েছিল যেন? ও—ব্র্যাবোর্নের সেই মিষ্টি মেয়েটা বোধহয়? যে আমায় কনগ্রাচুলেট করেছিল বলে তুই পরে বলেছিলি—"দাঁড়াও শালা, তোমায় দেখাচ্ছি মজা! গাছবাঙাল কোথাকার—সে আবার ডিবেট করে! কী করে শালা একটা লেগে গেছে—তার রং কত!"

তুই মজা দেখিয়েছিলি ঠিকই। ফেরার সময় পুঁটিরামে আমাকে আর কমলকে পেটভরে মিষ্টি খাইয়ে।

কমলের একটা কবিতার ক-টা লাইন আমার এখনও মনে আছে। সেই যে: "পুরোনো চিঠির ভোঁতা অক্ষরের গায় / ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে এই দুপুরে / সতীনাথ চিঠি লেখে ধানবাদ থেকে / শ্যামলিমা স্বামীসহ বরাকরে যায়।"—এটা ও আমাদের শুনিয়েছিল ক্যান্টিনে বসে। সঙ্গে আর কারা ছিল তাও আমার মনে আছে। বরুণা ছিল, মৃদুল আর গার্গীও ছিল।

কমলের দু-তিনখানা কবিতার বই বেরিয়েছে ইদানীং। নামী পুজোসংখ্যায় উপন্যাস ছাপা হয়েছে। এখন একটা বড় পত্রিকা অফিসে চাকরি করে ও। ভালো চাকরি। মাসে মাসে দেখা করতে যাই। তবে ও খুব ব্যস্ত থাকে। চা খাওয়ায়—সিগারেট খাওয়ায়। এরপর আমাদের সব কথা ফুরিয়ে যায়। আমি ওর ঠাণ্ডা ঘরটায়, ওর চেয়ারের ঠিক উল্টোদিকে আর একটা চেয়ারে বসে থাকি। ওর কাছে অনেক লোক আসে। কারো সঙ্গে ও হাসিমুখে কথা বলে—কারো সঙ্গে বা একটু গম্ভীর মুখে। কাউকে বসতে বলে, কাউকে কিছুই বলে না। এসব সময় ওকে লক্ষ করতে করতে আমার মনে হয়, ও একটা ওজন বাড়ানো-কমানোর খেলা খেলছে। আমাদের সেই কমল—যে একদিন দুপুর-বেলায় পুরনো কিছু চিঠি দেখে নস্টালজিক হয়ে পড়েছিল। আমি একসময় উঠে পড়ি। ও বলে: যাচ্ছিস? আসিস আবার।

আমি বেরিয়ে যাবার মুখে ও ডাকে: দীপু!

আমি বলি: বল।

ও চারদিক দেখে বলে: চল একদিন একটু জমিয়ে বসা যাক।

আমি বলি: চল না।

ও বলে : বেশ মালকাল খাওয়া যাবে। কত কথা মনে পড়ে রে দীপু। একদিন একটু বসি চল। কিন্তু কবে বসা যায় বল তো ?

আমি বলি : আমি যে-কোনো ছুটির দিনে সারাদিন ফ্রি থাকি। উইক ডেজে বিকেল থেকে। আমার কোনো অসুবিধে নেই।

ও বলে : তাহলে এই রোববার হোক।

আমি বলি : ঠিক আছে।

হঠাৎ কিছু ভাবে কমল। ভেবে বলে : না, এই রোববার নয়। সামনের রোববার। না-না-ঐদিন তো—ঠিক আছে বস্, তোকে আমি জানাব—তোর স্কুলে ফোন করে। বুঝলি ?

আমি ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে আসি। জানি, আমাদের দু-জনের জমিয়ে বসা আর হবে না। কমল খুব ব্যস্ত।

কী আশ্চর্য! তোকে তো আসল খবরটাই দেয়া হয়নি। ঋদ্ধিকে মনে আছে তোর ? আমাদের সেই ঋদ্ধি নাকি বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ। আগের চিঠিতে সব খুলে লিখেছিলাম তোকে। ধরে নিতে হচ্ছে, সে চিঠি তুই পাসনি। তাই আবার লিখছি।

মাসখানেক আগে দীপার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল পার্কসার্কাস বাসস্টপে। ও ব্র্যাবোর্নে পড়াচ্ছে। আমরা একটা রেস্তোরাঁয় চা খেতে গেলাম। কিছু কথা হল। দীপাই খবরটা দিল। ত্বিষার সঙ্গে ওর প্রায়ই দেখা হয়। ত্বিষা জানিয়েছে যে ঋদ্ধি প্রায় তিন মাস ধরে নিরুদ্দেশ। ওদের হাজারিবাগের বাড়িতেও খোঁজ করা হয়েছিল। সেখানে ও নেই। অফিসে খোঁজ করে জানা গেছে যে ও প্রায় মাস দুয়েক ধরে মাঝে-মধ্যেই অফিস কামাই করত। ত্বিষা খুব চেষ্টা করে যাচ্ছে খোঁজ পাবার। আর এরকম অবস্থায় যা হয় আর কী—প্রচুর গুজব রটছে।

একদিন আমি দেখাও করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওদের রিচি রোডের ফ্ল্যাট ফাঁকা। অবশ্য একটা চিঠি রেখে এসেছি নিচের দারোয়ানের কাছে। শিগগিরই একদিন যাব।

আচ্ছা, ঋদ্ধিকে দেখে ভাবা গিয়েছিল ও এরকম কিছু করতে পারে ? ওর চেহারাটা মনে আছে তোর ? একদম হলিউডের হিরো। অসম্ভব স্মার্ট, চোস্ত ইংরেজি বলত, ইকনমিক্সে দু-বারই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। ওদের বিয়ের দিনটাও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। দুপুরবেলা নেমন্তন্ন ছিল ওদের রিচি রোডের

ফ্ল্যাটে। ওটা তখন মাস দুয়েক হল ঋদ্ধি আর ত্বিষা ভাড়া নিয়েছে। ত্বিষা সম্ভবত তখন ব্যাংকের চাকরিতে জয়েনও করেছে।

যাইহোক, ঐদিন সকালেই বাড়ির কাছে গাড়ির শব্দ। আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আগেই। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, ঋদ্ধির শাদা প্রিমিয়ার পদ্মিনীতে বসে আছে ওরা দু-জন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দু-জনেই একসঙ্গে ডাকল। আমি কোনোরকমে ভদ্রস্থ হয়ে বাইরে যেতেই গাড়ির ভেতর থেকে ঋদ্ধি চেঁচিয়ে উঠল: কন্‌গ্রাচুলেশানস—বাস্টার্ড!

আমি একটু চমকে গেলাম: কেন?

ঋদ্ধি আবার চিৎকার করল: আমরা আজ বিয়ে করছি, সেইজন্যে। বেলা একটায় রেজিস্ট্রি হবে আমাদের রিচি রোডের ফ্ল্যাটে। দেরি করবি না কিন্তু— শার্প অ্যাট ওয়ান। পারলে আগে যাস, সবাই আসবে। যাই। আরো অনেককে ইনভাইট করতে হবে।

একতোড়ে কথাগুলো বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল ঋদ্ধি। ত্বিষা কোনোরকমে ওর অজস্র কথার মধ্যে একটু ফাঁক পেয়ে বলে উঠল: আসবি কিন্তু, না-হলে প্রচণ্ড ঝাড়ব!—ঋদ্ধি একহাতে ত্বিষার গলা জড়িয়ে ওকে কাছে টেনে বলল: ডোণ্ট বি রুড মাই সুইটি পাপি! ঝাড়ব বোলো না, বলো—আইল ব্যাশ ইয়ু আপ!

হাতটা সরাও—অসভ্য কোথাকার!—ত্বিষা ফুঁসে উঠল।

চিৎকার করে হেসে উঠল ঋদ্ধি। তারপর হাত নাড়তে নাড়তে ওরা চলে গেল। জানতাম ঋদ্ধির চিরকালই চমকে দেওয়া স্বভাব। তবু ঘুমচোখে পুরো ব্যাপারটা হজম করতে সময় লাগল। আমি ভ্যাবলার মতো ওদের চলে-যাওয়া-পথে তাকিয়ে রইলাম।

দুপুরবেলা গিয়েছিলাম। তুই আর নীরেন ছাড়া বাকি সবাই এসেছিল। নীরেন তখন বোধহয় বম্বেতে। আর তুই তো সাহেবদের দেশে।

খুব মজা হয়েছিল সেদিন। ওরা দু-জন বারবার তোর কথা বলছিল। দু-তিন পেগ মদ খেয়েই মৃদুল একদম আউট হয়ে গিয়েছিল। ভেউ ভেউ করে কী-কান্না! বারবার সবিতার হাতটা জড়িয়ে ধরে আর বলে: "আমি কেন এখনও বাবা হলাম না?"—আমরা তো হাসতে হাসতে খুন! আর বেচারা সবিতা—তুই ওর অবস্থাটা ভাব! আর হ্যাঁ, কমলও এসেছিল সন্ধে-নাগাদ। ঘণ্টাখানেক ছিল। বেশ গল্প করল। দু-একবার বলল: বাঃ—বেশ জমিয়ে

বসা গেল আজকে—অ্যাঁ? বেশ—বেশ!

তখন সবে ওর প্রথম বইটা বেরিয়েছে।

এই সেদিনের কথা। বছর দু-একও হয়নি। এর মধ্যেই সবকিছু কেমন আচমকা বদলে গেল। ঋদ্ধির মতো কেরিয়ারিস্ট, লাইভলি ছেলে হঠাৎ একদিন বউকে ছেড়ে কোথায় চলে গেল। আমি মাঝে মধ্যে ওদের ওখানে যেতাম। ছুটির দিনে সারাদিন জমিয়ে আড্ডা মেরেছি। আমার খুব ভালো লাগত ওদের। মাঝখানে কিছুদিন নানা ঝামেলায় যেতে পারিনি। আর তারপর একেবারে হঠাৎই এই খবর—আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি!

শুভ্র, ফ্রান্স থেকে লেখা তোর একমাত্র চিঠিতে (তাও আমার চিঠির উত্তরে) তুই লিখেছিলি—'আসলে কিছুই বদলায়নি। আমরা আমাদের ফেলে-আসা পথে উত্তরসূরীদের বসিয়ে এসেছি। নিজেরা যে-যার জায়গা কেড়ে নিয়েছি পূর্বসূরীদের কাছ থেকে। এখন দূরে আছি বলে। কাঁচাপাকা চুলে আবার আমরা ক-জন যখন এক হব, তখন দেখবি সেটাই স্বাভাবিক। এত নস্টালজিক হোস না—এতে জীবনটা অনেক ছোট হয়ে যায়।'

অথচ দ্যাখ, আমি তোর কথা রাখতে পারিনি। দিন দিন আমার স্মৃতিকাতরতা বাড়ছে। সারাদিন আমি আদেখলের মতো কুড়িয়ে নিচ্ছি আমাদের পাঁচ বছর আগের দিনগুলো। এখনই কোত্থেকে যে জরা আসছে রে শুভ্র!—আই গ্রো ওল্ড, আই গ্রো ওল্ড!

মাঝে মাঝে ভাবি—এবার বিয়ে করব। আবার ভাবি—কী হবে তাতে? এক নিঃসঙ্গতা থেকে আরো সাঙ্ঘাতিক, গভীরতর এক নিঃসঙ্গতায় ডুবে গিয়ে কী লাভ? যার সঙ্গে থাকব সে কি সেই মেয়ে যাকে প্রথম যৌবনে স্বপ্ন দেখতাম? সে কি কোথাও আছে? আর যদিই বা থাকে—আমার কাছে সে আসবে কেন? এই সর্বগ্রাসী স্মৃতির তাড়না ছাড়া তো আমার আর কিছু নেই। শুধু শরীরের চাহিদার কথা আমি কখনো ভাবিনি শুভ্র—তুই জানিস। তাই বোধহয় এই ভালো—এই একা থাকা।

আমি এখন ঘুমোব। বড় ঘুম পেয়েছে। মনে আছে তো—উত্তর না দিলে এই আমার শেষ চিঠি! উত্তর দিস শুভ্র—আমায় পুরোপুরি ছেড়ে যাস না!

ভালো থাকিস।

তোর, দীপ।

শুভ্রর চিঠি—প্রদীপকে

কুঁড়ে,

তোর চিঠি পড়ে প্রথমেই যে-কথাটা মনে হচ্ছে তা হল এই যে তুই খু ঘুমকাতুরে আর স্বপ্নবিলাসী। এ-ধরনের মানুষ আমি দু-চোখে দেখতে পারি না। এত স্বার্থপর আর আত্মকেন্দ্রিক এই লোকগুলো! সদ্য বিদেশ থেকে এসেছি বলে নয়। এ মনোভাব আমার চিরদিনের। তুই জানিস।

কিন্তু উত্তর দিতে হচ্ছে। প্রথম কারণ, চিঠিটা তুই লিখেছিস। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে আমার বিরুদ্ধে (বা আমার মতো লোকেদের বিরুদ্ধে) তুই কিছু অভিযোগ এনেছিস। আমি তাদের সবার হয়েই বলছি : তোর মতে অপদার্থদের পৃথিবী থেকে নির্বাসন দেবার সময় হয়ে এসেছে। যারা তোদের নির্বাসনে পাঠাবে, আমিই হব তাদের দলপতি।

প্রসঙ্গত এ-ও জানাই, তোর প্রথম চারটে চিঠি আমি পাইনি। কেন পাইনি কী বৃত্তান্ত এসব পাঁচালি পাড়তে আমি যাব না। আমারই তোর ওপর খুব রাগ হচ্ছিল চিঠি দিসনি বলে।

চিঠিতে আসল কথাটাই লিখিসনি। একবারও উল্লেখ করিস নি যে তুই কিছু লিখছিস কি না। একসময় আমিই ছিলাম তোর গল্পের প্রথম পাঠক।— আমি দুঃখ পেতে পারতাম, ভাবতাম আমি স্মৃতিকাতর নই বলে তুই তোর সমস্ত লেখাজোখা আমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখছিস। কিন্তু তুই জানিস আমি অভিযোগ জানাতে ভালবাসি না। তোকে শুধু একটা কথা বলব— স্মৃতি আমাদের সবাইকেই জ্বালায়—এক-এক রকম করে। কিন্তু এপর নস্টালজিয়াকে পুষে, তাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে আমি কেন পায়ে পায়ে পি এদিকে যখন জানি এ-হাঁটা অর্থহীন? স্মৃতিভারাতুর হয়ে তুই লিখিস না। এ সই করিয়ে যখন সেই স্মৃতির যন্ত্রণা সহনীয় হয়, একেবারে ব্যক্তিগত কষ্ট দিতে হবে ত যখন তা অনেকের কষ্টের কথা বলে। আমার দোষ কি এ আমি লিখতে পারি না? আমার সত্তা পাঠকের—কাতর হয়ে স্মৃতির

অনেকটাই যান্ত্রিক হয়ত বা (তাছাড়া তোরা তো আমাকে রোবট বলতিই)। চারপাশে যে দ্রুত জীবন বয়ে চলেছে তারই এক অংশীদার আমি। চুপ করে বসে বহমান দৃশ্য দেখে যাওয়াকে আমি মূর্খতা মনে করি, এতে গর্বের কিছু নেই।

যাহোক—একচোট ঝগড়া হল। এবার একটা মনের কথা বলি। যে-কোনো একদিন আমার এখানে চলে আয়। বেশ সময় হাতে নিয়ে। আমিও ছুটি নিই। কলকাতার সেই দিনগুলো খুঁজে না পেলেও—আমরা দুজন তো আছি। দেখাই যাক না কেমন কাটে ছুটির ক-টা দিন। এমনকি তুই ফেরার সময় আমি কিছুদিনের জন্যে তোর সঙ্গেও কলকাতায় যেতে পারি। কবে আসবি বল ?

তোর চিঠি পেয়ে কতকগুলো মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। তবে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটে যাচ্ছে ঋদ্ধির মুখটা। ও যে আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল—এমন নয়। বরং ওর প্রতি আমার একটু ঈর্ষা থাকারই কথা। আমার ওর মতো অনেককিছু থাকলেও (ওরকম সাংঘাতিক চেহারা বাদ দিয়ে অবশ্যই) ত্বিষা ছিল না। ত্বিষাকে আমি একসময় খুবই চাইতাম—তুই তো জানিস। কিন্তু এখন ওসব কিছু নেই। খালি তোর মতো আমিও খুব কনফিউজড। ঋদ্ধি কোথায় যেতে পারে ? ওরকম আউট অ্যাণ্ড আউট প্র্যাকটিক্যাল ছেলে কোনো এক মুহূর্তের আবেগে চলে যাবে—এটা ভাবা মুশকিল। এদিকে ঋদ্ধি অন্য কোনো মেয়েকে ফুসলে পালিয়েছে, এটাও বিশ্বাস করা যায় না। তবে দ্যাখ, শিগ্‌গিরই একদিন ঋদ্ধি ঠিক ফিরে আসবে। বেশি সুখে মানুষের বৈরাগ্য আসে, জানিস তো ? কিছুদিন হাটে-মাঠে ক্যা ক্যা করে ঘুরে বেড়ানোর পর সেই বৈরাগ্য কুটকুটে কম্বল হয়ে দাঁড়ায়—আর সেই আধন্যাংটো বৈরাগী, 'বাপরে ! মা-রে !' করতে করতে বাড়ি ফিরে আসে।

তৃতীয় যে সম্ভাবনাটা আছে, সেটার কথা ভাবতে চাইছি না। আর ওরকম কিছু হলে একটা টুকরো খবরও কি আসত না ?

যেখানে আছি সেটা মূল শহর থেকে মাইল পনের দূরে একটা [illegible]। গাড়ি বা টাঙায় আসা যায়। বাসও যাতায়াত করে। [illegible] ফ্যাক্টরির পেছনে বড় বড় পাহাড় আছে। আর আছে [illegible] ঘ-ওগরানো দৈত্যের মতো চিমনিগুলো। আমিও দিন

দিন ওগুলোর মতো হয়ে যাচ্ছি। আমার কাজ ফ্যাক্টরিতে। সেখানে হাজার লোকের অজস্র বায়নাক্কা। সকাল ছ-টা থেকে দুটো পর্যন্ত আমি সে-সব ধকল সামলাই। কথাবার্তার ঢং-ই বদলে গেছে। মাঝে মধ্যেই 'শুয়োরের বাচ্চা' বা আরো উঁচু দরের গালাগাল দিই। সবসময় কিন্তু রেগে গিয়ে নয়—কখনও আনন্দেও। বুঝতে পারছিস তো কোন্ অবস্থায় এলে এটা সম্ভব হয়?

আমাদের একমাত্র রিক্রিয়েশান এখানকার ক্লাবে সন্ধেবেলার পার্টি। সেখানে কয়েকজন আধুনিকা মা আমার পেছনে তাদের ডেভি (দেবযানী), ব্যাট্রিস (ব্রততী); এবং সুস্ (সুস্মিতা)-দের লাগিয়ে দিয়েছে। আমি এলিজিবল ব্যাচেলার। ছোটবেলায় গল্পে যা পড়তাম আমার এখন সেই অবস্থা। "চারো তরফ গোপিয়া" "বিচমে কানহাইয়া" আমি। মেয়েগুলো আশ্চর্য সাহসী। প্রায় কিছু না পরেই হাঁটাচলা করে। আর সবচেয়ে বড় কথা—ওরা সবাই একরকম। এখানকার মিশনারি স্কুলে পড়েছে। মাঝে মাঝে কলকাতায় গিয়ে জামা-কাপড় নিয়ে আসে। চুল ছাঁটে, মুখে হাবিজাবি কী সব করায়। একইভাবে হাসে, রাগ করে, কথা বলে—এবং কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। আমার বয়সী ছোকরা যে-সব আছে—তারা প্রায় সবাই বিবাহিত। সন্ধেবেলা বউদের নিয়ে ক্লাবে যায়। বউরা গল্প করে নিজেদের বরের বীরত্বের, এ-ওর নামে কুটনি কাটে। ছেলেগুলো জালার মতো মদ খায় আর জুয়া খেলে। যে দু-এক জনের এখনও বিয়ে হয়নি, তারা হয় এদেরই মধ্যে কারো ব্যর্থ প্রেমিক, কিংবা বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এখানকার মধ্যবয়স্ক পুরুষ বা মহিলারা যা—এরা দশ বা বিশ বছর বাদে সেরকমই হবে। ঠিক সেরকম।

যতই চামার হই—এখানে আর থাকতে পারছি না। প্রথম কয়েক দিন ক্লাবে গিয়ে খুব মদ খেয়েছি, সবার সঙ্গে গল্প করেছি। তারপর আর পারা গেল না। এখন দুপুরে ঘুমোই। সন্ধেবেলা কাগজ পড়ি (বইও পড়ি—বড়জোর লুডলাম বা হেলি), ঘরে বসে মদ খাই, খাবার খাই আর ঘুমোই। এখানে আর পাঁচ বছর থাকলে এসবের সঙ্গে পরের আইটেমটা যোগ হবে। তারপর ধাপসা হয়ে বউ নিয়ে ক্লাবে...ভাবলে মাথা বোঁ-বোঁ করতে থাকে। এদিকে অন্য কোথাও যেতে পারছি না। ফ্রান্সে পাঠাবার আগে এরা বণ্ড সই করিয়ে নিয়েছিল। এখন অন্য কোথাও চাকরি শুরু করলে যত টাকা দিতে হবে তা আমার নেই। অতএব—আরো অন্তত চার বছর।

এই হল এক মিস্ত্রির সমস্যা। সে-বেচারা স্মৃতিকাতর হয়ে স্মৃতির

কাছাকাছি ঘুরতে পারছে না, আবার চাকরিও করতে পারছে না মন দিয়ে। তোরা ভাবুক মানুষ—ইণ্টেলেকচুয়াল। কোনো নিদান থাকলে জানাস, কৃতজ্ঞ থাকব।

তুই কবে আসছিস বল? চিঠি পাঠাস, আমি স্টেশানে থাকব। আর হ্যাঁ, ঋদ্ধির খবর জানাস। আমাকে ধীরে ধীরে ঋদ্ধিতে পাচ্ছে। সেদিন ভোরে স্বপ্ন দেখলাম, আমি এক বিশাল মাঠের কাছে হাজির হয়েছি—প্রান্তর এক। সবুজ। তার মাঝখান দিয়ে পায়ে চলার পথ। আর আমার ঠিক ডানদিকে একটা অসম্ভব সাদা পাথরের মন্দির-জাতীয় কিছু। তার গায়ে একটা বিশাল কালো ঘণ্টা ঝুলছে। সেই মন্দিরের চাতালে সাদা পোশাক পরে খালি গায়ে বসে আছে খুব বিমর্ষ এক পুরোহিত। চারদিকে কোনো শব্দ নেই। এখানে বোধহয় পাখিও ডাকে না। মাঝে মাঝে এই বোবার মতো ভয়ংকর নৈঃশব্দ ভেসে যাচ্ছে ঘণ্টাধ্বনিতে। পুরোহিত একবার ঘণ্টা বাজিয়ে আবার বসে পড়ছে বিমর্ষ মুখে। চারদিকে শীতের বিকেলের মতো রোদ। আদিগন্ত মাঠ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। আর সেই মন্দির—সেই মানুষটা।

স্বপ্নটা ভয়ের নয়। বরং ওর মধ্যে একটা শান্তির ছবি আছে। আর মনে হয় সব স্থবির শান্তির মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক ধরনের অ-সুখ। তাও যেন আছে ওই স্বপ্নের ছবিতে। কিন্তু আমি খুব ভয় পেলাম স্বপ্নটা দেখে। কুলকুল করে ঘামতে ঘামতে জেগে উঠে মনে পড়ল, ঋদ্ধি কোথায় চলে গেছে। কদিন আগেই আমি তোর চিঠিটা পেয়েছিলাম। সেই থেকে ঋদ্ধিকে খুব মনে পড়ছে আমার।

খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছি। তাই ভয়ে থামছি। তুই একবার আয়। দেখবি আমারও অনেক কিছু মনে পড়ে—আমারও অনেক কথা বলার আছে। যে-কোনো দিন চলে আয়। অসুবিধে থাকলে জানিয়ে আসতেও হবে না। চিঠির সঙ্গেই ঠিকানা রইল। থামছি।

তোকে আর নতুন করে ভালবাসা কী জানাব?

শুভ

ত্বিষার ছোট্ট চিঠি—প্রদীপকে

প্রদীপ,

তোর রেখে-যাওয়া চিঠি পেয়েছি। পরশুই মাত্র ফিরেছি এক জায়গা থেকে। কাল তোর স্কুলে ফোনও করেছিলাম বিকেলে। তুই ছিলি না। তাই এই চিঠি লিখছি। তোকে অনেক কথা বলার আছে। তুই যে-কোনো একদিন চলে আয়। আমি বাড়ি পাল্টেছি। রিচি রোড ছেড়ে চলে এসেছি পাম অ্যাভিনিউতে। যেদিন এই চিঠি পাবি, সেদিন বা অন্য কোনোদিন বিকেল পাঁচটার পর চলে আসিস। ঠিকানা আর পথের ডিরেকশান অন্য চিরকুটটায় দিয়ে দিলাম।

আমি কেমন আছি তার কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিস তুই—এটা তোর রেখে যাওয়া চিঠি পড়েই বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার অবস্থাটা যে কী ব্যাপকভাবে মারাত্মক তা বুঝতে পারবি আমার সব কথা শোনার পর।

এখন যেখানে আছি সেখানে চারপাশের লোকজন আমার সম্বন্ধে খুব কৌতূহলী। আমি সিঁদুর পরি, অথচ একা থাকি। এটা মূলত মধ্যবিত্ত পাড়া, তাই খুব সিঁটিয়ে চলতে হচ্ছে। জীবনে এই প্রথম মনে হচ্ছে আমি কোনো বিরাট অন্যায় করে ফেলেছি। এখানকার রকে আড্ডা মারা ছেলেগুলো সেদিন আমি যাবার সময় এমন কিছু কথা বলল যাতে আমার মনে হল আমরা আবার জঙ্গলে চলে যাচ্ছি। কোনো অভিযোগ নেই আমার। এদের বিরুদ্ধে একেবারেই নয়। খালি শঙ্খবাবুর কবিতার সেই লাইনটা মনে পড়ছে— "আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না, কলকাতায় থাকে"। জানি না, ঠিক 'কোট' করলাম কিনা। একসময় আমরা এই লাইনটা নিয়ে খুব উত্তেজিত হয়েছিলাম। হঠাৎ মনে এল।

কী মনে হচ্ছে? কবিতার লাইন কোট করবার মতো মনের জোর এখনো আছে আমার? স্বীকার করছি, তা আছে। না হলে কী নিয়ে থাকব আর? তবু খুব অশান্তিতে আছি। তুই যতটা আন্দাজ করছিস, তার চেয়ে অনেক বেশিই।

একটা প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলাম। যেটা সবচেয়ে স্বাভাবিকভাবে লিখতে পারতাম, সেটাই লিখলাম না। তুই আয়—সব কথা হবে।

আসিস কিন্তু—

ত্বিষা

ত্বিষা

চিঠিটা খামে পুরে টেবিলের ওপর রেখে দিলাম। পার্সটা দিয়ে চাপা দিলাম। কাল সকালে অফিস যাওয়ার সময় মনে থাকবে তাহলে।

কতদিন পরে অফিস যাব কাল?—ঠিক সতের দিন। এই সতের দিন কেটেছে কী সাংঘাতিক ব্যস্ততায় ভাবলে এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। শিমুলতলা থেকে ফিরেছি গত শুক্রবার। ফিরে বাড়ি পাণ্টালাম। সব পুরনো আসবাবপত্র নিয়ে আসতে হয়েছে এখানে। তার ফলে আমার এই দু-কামরার ছোট ফ্ল্যাটটা উপচে পড়ছে যেন। খুব ঝক্কি গেছে।

অফিসে সবাই জিজ্ঞেস করছে, বাড়ি কেন পাণ্টাচ্ছি আমি? উত্তর দিয়েছি, খরচে পোষাচ্ছে না। একদিক দিয়ে সত্যি কথা। রিচি রোডের ঐ ফ্ল্যাটের ভাড়া দিতে গেলেই আমার মাইনে শেষ হয়ে যাবে। আর একটা কারণ আছে। সেটা কাউকে বলিনি। ঐ বাড়িতে স্বভাবতই পুরনো জামাকাপড়ের মধ্যে, বইপত্রে, আসবাবে ভুরভুর করছে গন্ধের মতো ঋদ্ধির স্মৃতি। জমানো যা টাকা আছে, তাতে আরও কিছুদিন ওখানে অপেক্ষা করতে পারতাম ঋদ্ধির ফিরে আসার কথা ভেবে। কিন্তু পারছিলাম না। ওই বিশাল বিশাল ঘরগুলো আমাকে একা পেলেই পিষে মারতে চাইত। ঋদ্ধি এদিক-সেদিক থেকে হঠাৎ-হঠাৎ বেরিয়ে আসত। আমাকে ডাকত—আদর করত। কখনও রাগ করত। কখনও গম্ভীরভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকত। এই জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকাটা অবশ্য ইদানীং শুরু হয়েছিল। আমি ভাবতাম ওর অফিসের কোনো গণ্ডগোল। আমার কাছে ও কিছু গোপন করত বলে মনে হয়নি কখনও। তাই একটু অবাক হতাম। কিন্তু খুব সিরিয়াস ভাবিনি ওর এই পরিবর্তনকে।

এখন বুঝি, আমি অনেক কিছুই ভাবিনি। আর ঋদ্ধি জানলার ধারে বসে ভেবে চলত। ও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। কারণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল

না। ওর বিবেক, কর্তব্যবোধ, অথবা, আর একটু আশা করে যদি বলতে পারি, ভালবাসা, ওকে আটকাত কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে। অবশেষে সবকিছু হেরে গেল, ঋদ্ধি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

ভাবতে অবাক লাগে—এই ঋদ্ধির কাজই ছিল ডিসিশন নেয়া। এই বয়সে ও অফিসে খুবই দায়িত্বপূর্ণ পোস্টে ছিল। ও বলত, ডিসিশন যারা নিতে পারে না—যাদের চাওয়া, না-চাওয়াগুলো নিজেদের কাছেই ধোঁয়াটে—তারা মেরুদণ্ডহীন। অবশ্য এতসব কথা ও একনাগাড়ে বাংলায় বলত না। মাঝে মধ্যেই গড়গড় করে কয়েকটা ইংরিজি সেনটেন্স বলে যেত, এই জন্যই আমরা ইউনিভার্সিটিতে ওর নাম দিয়েছিলাম—ছোট সাহেব।

ঋদ্ধি চলে যাবার পরে অনেকে এমন ইঙ্গিতও করেছে—ঋদ্ধি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ইলোপ করেছে। প্রথম প্রথম খুব রাগ হত। পরে অনেক ভেবে দেখেছি—এটা কি সত্যি হতে পারে না? কিন্তু অনেক ভেবেও উত্তরটা "হ্যাঁ" হয়নি।

কী করে হবে? মাত্র দু-বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে—কিন্তু সেই তো সব নয়। ঋদ্ধিকে তো আমি চিনি অনেক দিন ধরেই। আমি কি এতই বোকা যে ওর কথা, ওর আমার দিকে তাকানো, আমাদের সাড়ে তিন বছরের ভীষণ আনন্দে কাটা সময়গুলো—এইসব চিনতে ভুল করেছিলাম?

ঋদ্ধি চেয়েছিল—আমাদের একটা বাচ্চা হোক। আমিই জোর করে আরও কিছুদিন পিছিয়ে দিয়েছিলাম সব। প্রথমবার ও খুব রেগে গিয়েছিল। আর রাগলে ও বেশি কথা বলত না—চ্যাঁচামেচি ভীষণ অপছন্দ করত ঋদ্ধি। খালি হাঁ-হাঁ করত। আর খুব রেগে গেলে "ড্যামিট্!" বলে উঠে চলে যেত অন্য ঘরে বা বারান্দায় বা অন্য কোথাও। আমি তখন খুব লাগতাম ওর পিছনে। একে ফর্সা—আমার চেয়েও বেশি। তার ওপর রেগে গেলে মুখটা টকটকে লাল হয়ে যেত। ওকে রাগাতে আমার খুব ভালো লাগত। এভাবে সাড়ে তিন বছর কেটেছে। সাড়ে তিন বছর কি একেবারে মিথ্যে?

সবার কথা বিশ্বাস করতে গেলে ভাবতে হয়, গত কিছুদিন ধরে ঋদ্ধির অন্য কোনো মেয়েকে ভালো লেগেছিল। কিন্তু কতদিন ধরে? সেটা কি এতই বেশি সময় যে সাড়ে তিন বছরও তার কাছে খুব ছোট—ভীষণই তুচ্ছ? পরে জানতে পেরেছি, গত কয়েক মাস নিয়মিত অফিস যেত না ও। প্রায়ই ছুটি নিত। প্রথমদিকে বাড়িতে বসে থাকত কাজের দিন। আমি বার বার তাড়া

দিলে বলত—"আজ যেতে ইচ্ছে করছে না—প্লিজ তিষ্টি।"

তিষ্টি! নামটা মনে পড়ে গেল। ঋদ্ধি ডাকত এই নামে। বুকে মোচড় দিল একটু। এখন যদি আমি ওর ছবিটার দিকে তাকাই—ঠিক কেঁদে ফেলব।

আমি জোর করে ওকে অফিস পাঠাতাম। একটা পুরুষমানুষের এভাবে শুয়ে-বসে দিন কাটানো আমার একদম ভালো লাগত না। বিশেষত সেই পুরুষ যখন ঋদ্ধি। যার মুখে সবসময় আত্মবিশ্বাসের ছাপ—অফুরন্ত এনার্জি।

আমি ওকে তাড়া দিয়ে তুলে দিতাম। এমনিতে আমার আগেই ও বেরিয়ে যেত। কিন্তু এইসব দিনে আমরা একসঙ্গেই বেরোতাম। বাস স্টপে গিয়ে আমি উঠতাম ডালহৌসির মিনিবাসে। আর ঋদ্ধি যেত পার্ক সার্কাসের দিকে—ওর অফিসে।

এখন বুঝতে পারি, আসলে ও অফিস যেত না। আমি কেন এত জেদ করতাম? কেন ওকে জিগ্যেস করিনি ওর কিছু হয়েছে কিনা? কেন তাড়া দিতাম অফিস যেতে? যদি এসব না করতাম, তাহলেও কি ঋদ্ধি চলে যেত?

এইসব কথা ভেবে আমি কদিন খুব কেঁদেছি। এখন ঋদ্ধি চলে যাবার পর এই তিন মাসে আমি বাইরে অনেকটা শক্ত হয়েছি, আর ভেবে দেখেছি, ঋদ্ধিকে ফিরে আসতেই হবে। ভালবাসা কী—এখন আমি গুছিয়ে বলতে পারব না। এখন আমি জানি, তার কতখানি 'অভ্যেস' আর কতখানি 'প্রয়োজন'। বিয়ের দু-বছর পরে আমি এটা জানি। আর জানি যে আর কেউ এই প্রয়োজন মেটাতে পারবে না। অসম্ভব উন্নাসিক ঋদ্ধি—আমার প্রেমিক-বন্ধু-বর ঋদ্ধি কি অন্য কোনো মেয়েকে এরকম বোকার মতো ভালবেসে ফেলবে? সে কি এমনভাবে সব ছেড়ে যেতে পারে—যে মানুষ সন্তান চায়? যে বাড়ির বাইরে খুব বেশি সময় একা কাটাত না? এমনকী ড্রিঙ্ক করলেও আমার সামনেই করত। বেশি খেতে পারত না। তাহলে আমি ঝগড়া করতাম। কিন্তু মাঝে মাঝেই অল্প-স্বল্প খেত। তাতে আমি কোনোদিনও কিছু বলিনি।

তবে ঋদ্ধি কেন চলে গেল? আর গেলেও, কোথায় গেল—চিঠি দিল না, তিন মাস যেতেও ফিরে এল না। তিষ্টির কথা কি সে একবারও ভাবে? তিষ্টি যে খুব কষ্টে আছে—তা কি সে জানে?

আর একটা সম্ভাবনা আছে। সেটাও আমি ঋদ্ধির ব্যাপারে ভাবতে পারি না। ঋদ্ধির হঠাৎ সংসারে বিতৃষ্ণা এসে যাবে—আর সে ঈশ্বরের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে? আজকাল কি এটা বিশ্বাস করা যায়? বিশেষত মানুষটা

যখন ঋদ্ধি, যে জীবনে ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায়নি। সামান্যতমও নয়।

তৃতীয় সম্ভাবনার কথা আমি ভাবতে চাই না। এখন আমার দিনরাত পৃথিবীর সমস্ত দুর্ঘটনা—সব দুর্যোগের কথা মনে পড়ে। এই ভয়েই ছুটে গিয়েছিলাম শিমুলতলায়। রথীন খবর দিল, ওখানে নাকি কদিন আগেই এক ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছে। তাতে তিনজন লোক ভীষণ আঘাত পেয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে ফার্স্ট-এড দিয়ে ওখানকার এক প্রাক্তন জেলা শাসকের কাছে রাখা হয়েছে। তাকে দেখতে নাকি অনেকটা...

রথীন আমার সহকর্মী। ঋদ্ধিকে দু-একবার চোখে দেখেছে। তেমন আলাপও নেই। তবু আমি ওর কথা শুনেই চলে গেলাম শিমুলতলায়। স্টেশান থেকে একটু হেঁটে বাঁ-হাতি একটা বিশাল বাড়ি। সামনে লন। সেই লনে বসে আহত লোকটাই চা খাচ্ছিল। ওর বাঁ-হাতে ব্যাণ্ডেজ দেখে এটা আমি বুঝলাম। রথীনও ওকেই দেখিয়ে দিল।

প্রায় কিছু না খেয়ে আমি ট্রেনে উঠেছিলাম। ট্রেনেও দু-একবার চা ছাড়া কিছু খাইনি। আমি যে কত দুর্বল ছিলাম সেটা বুঝতে পারলাম লোকটাকে দেখে। আমার মাথা হঠাৎ ঘুরে গেল। একটা গাছ ধরে টাল সামলে নিলাম। দেখলাম, লোকটা ক্যালক্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর রথীনকে আমার একটা চড় মারতে ইচ্ছে করছিল। ভাগ্যিস ওসব কিছু করিনি। বেচারা রথীন! অফিস থেকে দু-দিনের ছুটিতে শিমুলতলায় গিয়েছিল ওদের ওখানকার বাড়িটা বিক্রির ব্যবস্থা করতে। গিয়ে ওই খবর পেয়ে, লোকটাকে দেখে, কী ভেবে ও আমায় খবর দেয় ও-ই জানে? ঐ লোকটার সঙ্গে ঋদ্ধির কী মিল ও দেখেছিল তা আমি কোনোদিন জানতে পারব না।

এমনই অদ্ভুত মানুষের মন যে এরকম অবস্থায় খালি দুর্ঘটনা, খুন-জখমের কথাই বেশি চোখে পড়ে। খবরের কাগজে, টিভিতে, যখনই দেখি কেউ মারা গেছে বা হাসপাতালে পড়ে আছে, তখনই আমার খালি ঋদ্ধির কথাই মনে আসে। অনেক খোঁজ নিয়েছি। ঋদ্ধি কোথাও নেই। কেউ ওর খবর দিতে পারছে না। যেন ও কোনোদিনই ছিল না পৃথিবীতে।

আমি যখন শিমুলতলা গিয়েছিলাম তখন একদিন প্রদীপ গিয়েছিল রিচি রোডের বাড়িতে। একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল। ওকে উত্তর দিয়ে দিলাম। ওর স্কুলে ফোন করা যেত—ওর বাড়ি যাওয়া যেত, কিন্তু থাক, চিঠিই ভালো।

অনেক কথা বলা যায় চিঠিতে।

প্রদীপ এলে ভালো হয়। ও পুরনো বন্ধু। ওকে অনেক কিছু খুলে বলা যায়—ও বুঝবে। আমি জানি ওর মুখ-চোখ থেকে কাদার মতো সহানুভূতি ঝরবে না। ও খুব কম কথা বলে। বেশি বোঝে। ঋদ্ধিও বোধহয় এইজন্যই ওকে খুব পছন্দ করত। এদিকে এমনিতে ওরা একেবারেই আলাদা ধরনের। প্রদীপ যেন ঋদ্ধি যা যা নয়--ঠিক সেই সবই। এলোমেলো, ইমপ্র্যাকটিকাল, অন্যমনস্ক—তবু ঋদ্ধি ওকে খুব পছন্দ করত। আমাদের বিয়েতে ও তো এসেছিলই, তার পরও দু-একবার এসেছিল আমাদের "হ্যাপি কর্নার"-এ। আমরা বেশ জমিয়ে আড্ডা মেরেছি সে সব সময়। ঋদ্ধি আর ও তর্ক করত যে কোনো বিষয় নিয়েই। যেন তর্ক করাটাই ওদের আসল উদ্দেশ্য। ঋদ্ধি খুব উত্তেজিত হয়ে যেত—ওর মুখ লাল হয়ে যেত—একটার পর একটা সিগারেট খেত—পায়চারি করত ঘরময়। প্রদীপ খুবই শান্তভাবে বসে ফোড়ন কাটত। ঋদ্ধি আরো চটে যেত। এদিকে আবার প্রদীপ এলে ও ভীষণ খুশি হত। এরকমই হয় বোধ হয়। প্রত্যেক মানুষই বোধ হয় আসলে ঠিক অন্য ধরনের একটা মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়।

মাত্র সাড়ে নটা বাজে। অথচ চারদিক চুপচাপ। এবার আমি খাব। ঘুমোতে যাব। আর বিছানায় শুয়ে বাতি নিভিয়ে দিলেই ঋদ্ধি আবার আমায় ছেয়ে নেবে। এক অন্য যন্ত্রণা হবে আমার। শরীরটা ছটফট করবে ঋদ্ধির শরীরের জন্য। ঋদ্ধি আমাকে পাগল করে দিত। আমার অবশ্য শরীর-মিলনের অভিজ্ঞতা খালি ওর সঙ্গেই। তবু আমার মনে হয়—ও অসম্ভব দক্ষ ছিল এ-ব্যাপারে। আমি ওর সঙ্গে ওই বিশেষ সময়গুলোতে কোন সুখের যন্ত্রণায় যে হারিয়ে যেতাম, তাই ভাবি।

আমার জানলা দিয়ে দু-একটা তারা দেখা যায়। আকাশটা খুব কালো। আমি সেদিকে তাকিয়ে থাকি। নামমাত্র খেয়েছি। এখন আমি একা—আরো একা। অন্ধকার ঘরের দিকে তাকাই। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে-থাকা ঋদ্ধি যেন এইমাত্র এক হয়ে খাটে উঠে এল। খুব অন্ধকার। আমি ওকে ছোঁবার জন্য হাত বাড়ালাম দারুণ তৃষ্ণায়। কিন্তু ঋদ্ধি তো আসলে খণ্ড খণ্ড অন্ধকারে গড়া। ওকে কি ছোঁয়া যায়? আমার কান্না পেল। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলাম আমি। প্রতি মুহূর্তে আশা করছি এবার কেউ বুঝি 'তিষ্টি'র গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে। কিন্তু কেউ নেই। ঘরভর্তি অন্ধকারে আমি একা। আমি কাঁদছি।

প্রদীপ

লোকটা অকারণেই আমার ওপর রেগে গেল। প্রচণ্ড ভিড়ের বাসে কেউ পা মাড়িয়ে দিলে খুব রাগ করার কিছু নেই। তার ওপর আমি এমনিতেই মুখচোরা, কিন্তু আজ আমার পায়ে একটা ছোট কাটা ছিল। পা ঘষটে গিয়েছিল ইটে বা অন্য কিছুতে। সেই পায়ে—সেই কাটা জায়গার ওপর লোকটা যখন ভর দিয়ে দাঁড়াল তখন আমি 'আঃ'! বলে আঁৎকে উঠেছিলাম খালি। লোকটা আমার দিকে তাকাতে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলাম, "দাদা, পা-টা যদি একটু..."। ওতেই লোকটা চটে গেল। খ্যাকখ্যাক করে উঠল—"ভিড়ের বাসে ওরকম একটু হয়—এতেই অত কষ্ট হলে বাসে ওঠা যায় না—বুজলেন?"—আমি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছিলাম। চুপ করেও গিয়েছিলাম। তবুও ও যাদবপুরের মোড় পর্যন্ত নানা ভাবে, নানা কৌশলে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগল, দু-একজন উৎসাহী দর্শকও জুটে গিয়েছিল। তারা টীকা-টিপ্পনি কাটছিল। যাদবপুরে আমি ঝুপ করে নামতেই কে একটা বলে উঠল —"দাদা টিকিট কেটেছেন তো?"

অনেকদিন বাদে আমার কেমন একটা গ্লানিবোধ হল। রতনের দোকানে ঢুকে আমি একটা চা খেতে খেতে ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবলাম। তারপর বিনয়বাবু দোকানে ঢুকতেই উঠে পড়লাম। পয়সা মিটিয়ে বেরোতে যাচ্ছি। কিন্তু উনি ঠিক ধরে ফেললেন।

"কী! কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

ভদ্রলোকের চেহারাটা সিড়িঙ্গে হলেও বাজখাঁই গলা। আমি এই ধরনের লোক একদম বরদাস্ত করতে পারি না। কিন্তু আমার চেহারায় ব্যক্তিত্বের কোনো ছাপ নেই বলেই হয়তো বা এরা আমায় খুব ভালবাসে। অকারণেই ধমকে কথা বলে—উপদেশ দেয়।

"বসুন মশাই, তাড়া কিসের অ্যাঁ—? বাড়িতে কেউ পথ চেয়ে বসে আছে নাকি—অ্যাঁ—?"

ওর ধারণা খালি সে জন্যেই লোকে বাড়ি যায়।

আমি বললাম—"না, আসলে একটু তাড়া ছিল"।

"আরে রাখুন মশাই—! আপনার আবার তাড়া কিসের-অ্যাঁ, তাড়া দ্যাকাচ্চে!" —বলেই এক হাতে আমার একটা হাত ধরে রতনকে বললেন "অ্যাই, দুটো চা দেবে, একটা খালি লিকার, কম চিনি দিয়ে।" উনি রোজই এই কথাটা বলেন।

আমি খুব মিষ্টি হেসে হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম, "না, এবার যেতে হবে।" বলেই চট করে বেরিয়ে এলাম।

"ও! খুব কাজ দ্যাকানো হচ্চে—না? ঠিক আচে, আমারও মনে থাকবে—"

উনি আমায় কী বলতে চাইছেন আমি তাই বুঝলাম না, বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে আমায় নিয়ে লাফালাফি না করতে পেরে একটু অভিমান হয়েছে। আমি খালি "কাল সন্ধেবেলা—এই সময়" গোছের কথা বিড়বিড় করে বলতে বলতে হাঁটতে লাগলাম।

ত্বিষার মুখটা বারে বারে মনে পড়ছে। বহুদিন পরে ওকে দেখলাম। এভাবে দেখতে চাইনি। ওর মুখে এক ভীষণ ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। অথচ ওকে দেখলে, ওর সঙ্গে কথা বললে, 'বেচারি' জাতীয় সহানুভূতিসূচক কথা মাথায় আসে না। এই আঘাত ওকে অনেক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলেছে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতা নেমে আসে ওর চোখে। কিন্তু তা নেহাতই কিছুক্ষণের; ধীরে—সংযত ভঙ্গিতে কথা বলে ত্বিষা। কত বদলে গেছে ও! কিন্তু আমার এই নতুন ত্বিষাকে খুব ভালো লাগল!

ঋদ্ধির সঙ্গে ওর এতদিনের সম্পর্ক যে শুধু বৈবাহিক নিয়মে বাঁধা নয় তা আজ আমি আরও ভালো করে বুঝলাম। এক ধরনের প্রয়োজনবোধ, এক ধরনের তীব্র অভাব ঘিরে আছে ওর সমস্ত কথাবার্তা—সব ভঙ্গিমা। ও অনায়াসে কলেজ স্ট্রিটে ওর মায়ের কাছে গিয়ে থাকতে পারে—কিন্তু থাকবে না। ঋদ্ধিকে ও খুঁজে বের করবেই যেন পৃথিবীর কোনো এক কোণা থেকে। আবার ও ভাবে ঋদ্ধি একদিন নিজে থেকেই ফিরে আসবে। সব ঠিক হয়ে যাবে। ওরা দুজনে আবার ফিরে যাবে ওদের রিচি রোডের ফ্ল্যাটে। নতুন করে শুরু করবে জীবনটাকে। হয়তো আরো একটু গুছিয়ে—পরস্পরকে আরো একটু বুঝে—

ব্যাস-এই পর্যন্ত! এই বিশ্বাস আর আশা নিয়েই আছে ত্বিষা। চাকরিতে জয়েন করেছে। প্রাণপণে খোঁজ করছে ঋদ্ধির, যে ঋদ্ধি একদিন ওর প্রেমিক ছিল—স্বামী, বন্ধু সব ছিল। যে ঋদ্ধি একদিন অকারণেই সব ছেড়ে কোথায় চলে গেছে।

ঋদ্ধি চলে যাবার আসল কারণ কেউ জানে না। ত্বিষা যা বলল—সবই বলেছে মনে হয়—তাতেও স্পষ্ট করে ফুটে ওঠে না এমন কোনো উদ্দেশ্য যা ঋদ্ধিকে ঘরছাড়া—দেশছাড়া করে নিখোঁজ করে দিতে পারে।

কী চেয়েছিল ঋদ্ধি? সুখ, সংসার, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রেম—এই সব কিছুই কি অসহনীয় হয়ে গিয়েছিল ওর কাছে? —কেন হবে? জ্ঞানীরা বলেন, অতুল বৈভবেও নাকি মানুষ উদাসীন হয়ে যায়। তখনই নাকি আসে সন্ন্যাস—পরম বাণপ্রস্থ। কিন্তু ঋদ্ধি—আমাদের ঋদ্ধি—!

ওর সব কথা শুনে যাওয়া ছাড়া আমার কিছুই করার ছিল না। ওকে সান্ত্বনা দেবার ধৃষ্টতা আমি দেখাইনি, ওর এই শোকের—কষ্টের মধ্যে দিয়ে এক মর্যাদার অহংকার দেখতে পেয়েছি ওর কথায় এবং আচরণে। আমি খালি বলে এসেছি—কোনো প্রয়োজন হলেই যেন ত্বিষা আমাকে ডাকে। আমি তৈরি থাকব সবসময়। আমি অনেক কিছু বুঝি না। বড় স্মৃতিকাতর আমি। আসলে আমি বোধ হয় এই সমস্ত মুহূর্তগুলোকে ভেতর থেকে বিশ্বাস করি না। আমার বাস অতীতে। তাও শৈশবে নয়। আমার শৈশব খুব সাদামাঠা। কলকাতায় বেড়ে উঠতে উঠতে আমি খালি দেখেছি আমার চারপাশের দারুণ এক দৈনন্দিনতাকে। এইজন্যেই আমার বাবা—যে রেলে গার্ডের চাকরি করত, আমার মা—যে সারাজীবন রান্না করা আর সন্তানের জন্ম দেয়া ছাড়া আর কিছু করেনি—আমার মনে কোনো রেখাপাত করেনি। ভুলে গেছি এদের মুখ। মৃত্যুর পরের দু-এক বছরের মধ্যেই। রুমকির কথা খালি মনে পড়ে মাঝে মাঝে। এখন পুরুলিয়ায় আছে। সেখানে ওর বর, এক ডব্লিউ বি.সি.এস চাকুরে, এখন পোস্টেড। প্রায়ই চিঠি দেয়। আমিও লিখি দু-একটা। দাদাকে আমি প্রায় ভুলে গেছি। এখন মাঝে মাঝে দাদার মুখ আর বাবার মুখের মধ্যে কোনটা কার আমি বুঝতে পারি না। গণ্ডগোলের সূত্রপাত বাবার একটা যুবক বয়সের ফোটো থেকে। কোনো এক গ্রামের বাড়িতে তোলা। ধুতি আর শার্ট পরা আমার তরুণ বাবা তার বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে। চুল সপাটে পিছন দিকে ফেলে আঁচড়ানো—চোখে একটা কাঠ কাঠ হাসি। বাবার বন্ধুকেও অনেকটা ওরকম দেখতে!

এসব পুরনোকালের ছবিতে একটা জিনিস আমার বড় আপত্তিকর ঠেকে, তা হল এই সব ছবির মানুষদের নিজেদের স্বাস্থ্যকে জাহির করার দারুণ চেষ্টা—যা আমার কাছে অসম্ভব হাস্যকর মনে হয়। বাবার ছবিটাও ঠিক এই ধরনের।

এই ছবিটা কী করে যেন আমার কাছে রয়ে গিয়েছিল, একদিন হঠাৎই হারিয়ে গেল। এই মাস আটেক আগে। তার পর থেকে কখনও কখনও দাদার মুখও আমার কাছে আবছা ঠেকে। সেখানে ভেসে ওঠে বাবার মুখ। দু-জনের মুখের গঠনে আসলে হয়তো কোনো মিলই নেই। তবু এ এক ধরনের বিস্মৃতি।

কিন্তু আমার মনে আছে কলেজ ও ইউনির্ভাসিটির দিনগুলো। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। আমি টুকরো টুকরো স্মৃতি সেই সময় থেকে তুলে আনতে পারি— আনিও। তখনকার কোনো উল্লাস, কোনো ব্যর্থতা এখনও আমায় ভয়ানক নাড়া দেয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, তবে কি আমি শুধু পাঁচ বছরই ছিলাম এই পৃথিবীতে? কলেজ জীবনের পাঁচ বছর?

এই কঠিন স্মৃতির বাঁধনে আটকে আছি আমি। তাই এই যে সব ঘটনাপরম্পরা চারদিকে—এর সঙ্গে আমার যেন কোনো আত্মিক যোগাযোগ নেই। অথচ আমি আনন্দ পাই, দুঃখ পাই—কখনও কখনও গ্লানিবোধ জাগে। ত্বিষার প্রতি আজকের আমার যে অনুভূতি তা কি ত্বিষা আমার এককালীন সহপাঠিনী না হলে জাগত? যদি না আমি আমার স্মৃতির ত্বিষার মুখের সঙ্গে এই মুখটা বারবার মেলাতে পারতাম তবে কি এটা হত?

আমি সব কিছুকে বড় ভাঙি। বড় নির্মমভাবে সাজিয়ে বিচার করি। আমি জানি এমনটাই থেকে যাব।

এই এসে গেছে আমার 'তারা হোটেল।' রাতের খাওয়া সেরে আমায় ঘরে ফিরতে হবে। রাত দশটায় যখন আমায় খেয়েই ঘরে ফিরতে হবে—আমার এককোণা রাজবাড়িতে—তখন আর কীই বা ভাবব আমি? কী লিখব?

STATE CENTRAL LIBRARY
89565
4.3.94

শুভ্র

এটা স্টেশনে যাবার রাস্তা, গিরিডি থেকে কলকাতার কানেক্‌টিং ট্রেনটা আসার সময় হয়ে গিয়েছে। তাই এই ছোট্ট পিচের রাস্তা দিয়ে হু হু করে ছুটে যাচ্ছে টাঙ্গাগুলো। বেঢপ দেখতে কয়েকটা বাস চলে যাচ্ছে দূরে পাহাড়ের দিকে। কিছুক্ষণ পরেই এই রাস্তা একদম ফাঁকা হয়ে পড়বে। তখন ছোট ছোট অগুনতি নাম-না-জানা পাখি রাস্তায় নেমে খেলতে থাকবে। চারদিকে শেষ বিকেলের নিস্তব্ধতা নেমে আসবে।

সদ্য পুজো শেষ হয়েছে। এর মধ্যেই এখানকার বাতাস ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। দিন ছোট হচ্ছে, আর আমি এই সময় স্কুটার খারাপ করে ভ্যাবলার মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি!

কিন্তু কোনো লাভ নেই। আমাদের 'মুরজমোহন কলোনি'-এখান থেকে প্রায় ততটাই দূরে যতটা দূরে স্টেশান। যাতায়াতী বাসগুলো আমায় ফিরেও দেখছে না। কী করব সেটা স্থির করতে না পেরে আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে এখন পথের এক পাশে বসে আছি। এদিকে দুশ্চিন্তাও হচ্ছে, কারণ পনের মিনিটের মধ্যেই ট্রেনটা এসে পড়বে। এই ট্রেনে কলকাতা থেকে বেশ কিছু হোমড়া-চোমড়া লোক আসবে। আমি এবং আমাদের সিনিয়র এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মদন ঝা ওদের রিসিভ করতে যাব এইরকম কথা ছিল। কিন্তু ঘণ্টা খানেক আগে মদন ফোন করে জানিয়েছে ও যেতে পারছে না।

"বহোত বুখার হ্যয় বোস, তুম চলে যাও।"--গোঙানো গলায় বলল মদন। গলা শুনেই মনে হচ্ছিল শালা ভান করছে!

"হোয়াট দ্য হেল ডু ইয়্যু মিন মদন? হাম আকেলা নহি যা সকতে, উই আর সাপোজ্‌ড টু গো টুগেদার"—আমি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম।

'প্লিজ ইয়ার, জরা সুনো তো সহি. টেল দেম আই হ্যাভ আ ফিল্‌দি হেডেক। হোয়ায় ডোণ্ট য়ু আন্‌ডারস্ট্যাণ্ড বস্‌, আয়ম ডাইয়িং..."

'লাইক হেল্‌!'—আমি ফোন নামিয়ে রেখেছিলাম। মাথা জ্বলে যাচ্ছিল

আমার। মদন বেশ সুন্দর কাটিয়ে দিল। কিন্তু আমি কী করব? যেতে তো হবেই!

জার্মানি থেকে একটা নতুন মেশিন এসেছে। সেটার তদারক করতে আসছে কয়েকটা বুড়ো-হাবড়া। ওদের দেখলে মাথার ঠিক থাকে না! আর কী সব লম্বাচওড়া বুকনি! প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেকটা ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়—আমাদের মতো নতুনদের মানুষ বলেই মনে করছে না। ফাঁক পেলেই বাঁকা-বাঁকা কথা শোনায়, ইয়ার্কি মারে। কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। এদের দারুণ কানেকশন। মুখ খুললে—মানে মনে যা যা জমছে সব যদি শুনিয়ে দিই তো কেরিয়ারের বারো বাজিয়ে ছেড়ে দেবে।

মনে মনে চোস্ত সব গালাগাল করতে করতে স্কুটারে চাপলাম। কোম্পানির গাড়ি স্টেশানে মজুত থাকবে আগে থেকেই। ঠিক করেছিলাম গিরধারীর দোকানে স্কুটারটা রেখে ওদের সঙ্গে গাড়িতে ফিরব।

তখন কিন্তু স্কুটার আমাকে কিছু বুঝতে দেয়নি। অনায়াসেই স্টার্ট নিল। আমি স্বচ্ছন্দে ফার্স্ট থেকে সেকেণ্ড হয়ে থার্ড গিয়ারে উঠলাম, প্রয়োজনে নামলাম। তারপর হঠাৎ এইখানে—এই মাঝপথে এসে গোঁ-গোঁ করতে করতে বেইমান দাঁড়িয়ে গেল। যা যা টোটকা জানি সব কাজে লাগিয়েছি। কিন্তু শালা গোঁয়ারের মতো মুখ সরিয়ে নিয়েছে—আর যাবে না।

আমার কপালেই এসব ঝামেলা জোটে। সব জায়গার মতো এখানেও একটা আমলাতান্ত্রিক ব্যাপার চালু আছে। এই যে মদন গেল না এতে ওর কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমি না গেলে?—প্রথমে রাতে ফোনে, তার-পর কাল সকালে অফিসে ঝাড়! কী ভুলই করেছিলাম তখন ফ্রান্স যাবার টোপটা গিলে, শালারা চাকর বানিয়ে ফেলেছে!

খুব তিতিবিরক্ত মনে আমি স্কুটারে চাবি লাগালাম। দাঁড় করিয়ে দিলাম ওটাকে। একটা টাঙ্গা থামালাম। লোকটাকে কিছুই বলতে হল না। ও জানে এরকম অবস্থায় একটাই গন্তব্য স্থান হতে পারে। ও চালাতে লাগল।

সন্ধে হয়-হয়। ঘর-ফিরতি পাখি ডাকছে। দূরে শালের জঙ্গলে একটু-একটু করে অন্ধকার নামছে। চড়াই উতরাই ভাসিয়ে একটা সন্ধে-সন্ধে গন্ধ নাকে ভেসে আসছে আমার। কতদিন কোথাও যাইনি। যাবার কথা মনে হলেই কলকাতার ছবি ফুটে ওঠে চোখের সামনে। ঘিঞ্জি-বুড়ি শহর। কিন্তু খুব মন-কেমন করে ওর জন্য। কতদিন দেখিনি সন্ধেবেলা আলো-জ্বলে ওঠা ধর্মতলার

ভিড়—রবীন্দ্র সদনের ফোয়ারা—ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস—চেনা সব মুখ—

হঠাৎ ঋদ্ধির মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। তারপর ত্বিষার মুখ। এবার চোখের সামনে ওদের একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি! কিন্তু ঋদ্ধির ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। কোথায় গেল ও? যদি সংসার ছেড়ে এরকম একটা জায়গার তথাকথিত শান্তি বেছে নেয়—তবে শিগগিরই ক্লান্ত হয়ে ফিরে যাবে! কিছু কিছু লোক আছে যাদের চোখে মুখে কেমন একটা 'চলে-যাই ফিরে-যাই' ভাব থাকে। তারা সন্ন্যাসী কি না আমি বলতে পারব না। তবে এটা বোঝা যায় যে তারা খুব গা বাঁচিয়ে আছে। যে কোনোদিনই যেন সব ছেড়েছুড়ে চলে যাবে। কিন্তু ঋদ্ধি?—

ত্বিষা আমার একটা পুরনো ব্যথার জায়গা। মাঝে মাঝে একেবারে একলা রাতে আমি সেই জায়গায় হাত বোলাই আর ত্বিষার মুখ মনে করি—তাকে ডাকি। কষ্ট হয় আমার। কিন্তু সেই কষ্ট ভালো লাগে। প্রথম বয়সের ব্রণর মতো। হাত দিলেই কেমন একটা চিনমিনে ব্যথা হয়—সেই রকম। ত্বিষা আমায় কোনোদিন ভালবাসেনি জেনেও, ও ঋদ্ধির বউ জেনেও, আমি আমার তীব্রতম অনুভূতিগুলো দিয়ে ওকে ডাকি। ত্বিষা আসে না! কী অদ্ভুত—স্বপ্নেও আসে না ও!

আমি অবশ্য খোলাখুলি ওকে কোনোদিনও, যাকে বলে প্রেম নিবেদন, করিনি, তবু ও নিশ্চয়ই বুঝেছিল। ওর মতো মেয়ের এই অভিজ্ঞতা এতবার হয়েছে যে, না বোঝার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এটাকে ও পাত্তাই দেয়নি। বাড়ায়নি। কোনোরকম রাগ-ঘেন্না-তাচ্ছিল্য দেখায়নি। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার সঙ্গে কথা বলেছে, হেসেছে, ইয়ার্কি মেরেছে। খালি ত্বিষা কোনোদিনও আমার সঙ্গে একলা হয়নি। কোনো গভীর কথা বলার সুযোগ দেয়নি আমাকে। এতে প্রথমে আমার খুব রাগ হত—ভাবতাম ও আমায় তাচ্ছিল্য করছে। আমার মধ্যে যে একটা পরিণত পুরুষ আছে, সেটা যেন ও মানতেই চাইছে না। পরে—ঋদ্ধির সঙ্গে ওর সম্পর্কটা যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন বুঝলাম—তা নয়। আসলে ত্বিষা আমায় একবিন্দুও প্রশ্রয় দিতে চায়নি কোনোরকম বাড়াবাড়ি না করেও। ওদের দুজনকে চমৎকার মানিয়েছিল। কিছুদিন উঠতি বয়সের যৌন-ঈর্ষায় ভুগেছি আমিও। এখন আমার মনে কোনো ঈর্ষা নেই। খালি ত্বিষা আমার একটা চিনমিনে ব্যথার অনুভূতি—বয়ঃসন্ধির ব্রণর মতো।

কিন্তু ঋদ্ধির চিন্তাটা আমায় কিছুতেই ছেড়ে যাচ্ছে না। আজকাল মাঝে মধ্যেই ওকে আমি দেখি। ভুল বললাম—ঠিক ওকে নয়—আমি দেখি এক নির্জন মন্দিরে এক বিষণ্ণ পূজারীকে। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে বারবার মনে হয় ও-ই ঋদ্ধি। কখনও বেশি রাতে—খাওয়ার পরে রাস্তায় যদি একটু ঘুরি, মনে হয় কে যেন ডাকছে—"আয় না— !" ডাকটার মধ্যে এমনই এক হিস্‌হিসে ভাব আছে যে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা সাপ নেমে যায় কোমরের দিকে। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসি। কার কণ্ঠস্বর শুনি তাতো আমি জানি না। তবে মনে হয়—ওটা ঋদ্ধিরই। কোনো যুক্তি নেই. প্রমাণ নেই, তবু ভাবি ঋদ্ধি ডাকছে।

নিজের কণ্ঠস্বর নামিয়ে, যাতে টাঙাওয়ালা শুনতে না পায়—আমি বললাম—"শুভ্র, আয় না—আয় না !"

চারদিকে রাত নেমে গেছে কখন হঠাৎ করে। কন্‌কনে বাতাস বইছে। টাঙ্গাওয়ালা নিঃশব্দে চালাচ্ছে। নিজের কণ্ঠস্বরে আমি নিজেই চমকে গেলাম।

প্রদীপের কথা মনে পড়ছে। কতদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে ? অথচ এই আমরাই ক-বছর আগে কেমন চূড়ান্ত বাউণ্ডুলেপনা করে বেরিয়েছি গোটা কলকাতা জুড়ে ! —বা বাইরে বেড়াতে গিয়ে—হাজারিবাগ—শান্তিনিকেতনে ! ওর চিঠিটা পড়ে একটু কষ্ট হয়েছিল আমার। এমনভাবে কেউ লেখে ? আশা করি ভুল বোঝাবুঝিটা এতদিনে মিটে গিয়েছে। ও আমার চিঠি পেয়েছে নিশ্চয়ই ?

মনে মনে চিৎকার করে বললাম—"আমি কি রোবট রে শালা—সব ভুলে যাব ?"

যা ভেবেছি ! ট্রেন বেশ কিছুক্ষণ আগে এসেছে। ড্রাইভার গাড়িটা নিয়ে স্টেশানের ঠিক মুখেই দাঁড়িয়ে আছে। আমায় দেখে চেঁচাল—"ক্যয়া খবর ছোটাসাব, —ইত্‌নি দের লাগাদি আপনে ?" ওকে হুঁ-হাঁ গোছের জবাব দিয়ে আমি ছুটলাম এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে। তিনটে প্রায় একই রকম চেহারার বুড়ো একটা স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল। দেখলেই বোঝা যায় ওরাই তারা। আমি দৌড়ে গেলাম কাছে। বিগলিত মুখ করে বললাম : "সো স্যরি, অ্যাক্‌চুয়ালি ইৎস মাই..."

ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে মোটা আর ফর্সা সে আমেরিকান কায়দায় খুব

ক্যাজুয়ালি হাত ঝাঁকিয়ে আমায় থামাল : "সো ইয়্যু আর সুভ্রা বোস্, ওয়াটাবাউট ম্যাডান ঝ্যা ?"

আমি মদনের সমস্যাটা (!) জানালাম।

"হ্যাভ্ ইয়্যু গট দ্য কার রেডি ?"—মোটা জিগ্যেস করল। আমি রীতিমতো উৎসাহ দেখিয়ে ঘাড় ঝোঁকালাম। আর মনে মনে বললাম—"শালা বেজন্মা, কলকাতায় এসব থাকত ! বাইরে এলেই পুরো অ্যামেরিকান-না ?"

ওদের মধ্যে চায়ের দাম মেটানো নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা লেগে গেলে আমিই দামটা দিয়ে দিলাম। তারপর চূড়ান্ত চাটুকারিতার সব কথা বলতে বলতে স্টেশানের বাইরে নিয়ে এলাম। গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই একজন—ভিজয়, বিজয় নয়, মদের দোকানের খোঁজ করল। এই খেলাটা শিখে গেছি, তাই চট করে বলে দিলাম, সব ব্যবস্থা বাংলোতেই আছে।

তারপর চলতে লাগল রোলিং মেশিনটা নিয়ে নানা কথা। আমাদের ফয়েল নাকি অন্য কোনো কম্পানি জাল করছে। হাসি পায় না এমন সব ঠাট্টা করল ওরা। আমি চোয়াল ব্যথাতে ব্যথাতে হাসলাম। আমাকে বেশ কয়েকটা খোঁচা মারল, আমি গিলে নিলাম—হাসলাম। আর গোটা সময়টা মনে মনে খিস্তি দিলাম —"শুয়োরের বাচ্চা ! ব্লাডি অ্যাস !"—নিজেকে।

তারপর ওই তিন হাবড়াকে বাংলোয় ছেড়ে, দাঁত কেলাতে কেলাতে চোয়াল ব্যথা করে, সুখনকে দিয়ে স্কুটার নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে সাড়ে-সাতটার সময় কোয়ার্টার্সে ফিরলাম।

লাল কাঁকর বিছানো পথ এই বিশাল কম্পাউণ্ডটার। বাঁ-হাতে বিবাহিত চাকুরেদের বাড়ি। ডানদিকে ছ'টা দোতলা বাড়ি, ডর্মিটরি, আমাদের জন্য। সব ঠিক আছে, কিন্তু সবাইকে গণ-ক্যান্টিনে খেতে যেতে হয়—এটা বিরক্তিকর।

আরো বিরক্তিকর মকবুল বেগ-এর গান। ওর ফ্ল্যাটটা ঠিক আমার পাশেই। অ্যাকাউন্টস-এর এই ছেলেটা কাজ ভালোই করে। কিন্তু রোজ সন্ধেবেলা গাড়োলের মতো মদ খায়। তারপর চেঁচায়। কী ভয়ঙ্কর ওর ওই মোটা গলার বেঢপ গান !

তবে এখানকার লোকেরা একে বলে 'প্রি-ম্যারেজ ইচিং'। অতএব মকবুল বোধহয় শিগগিরই ম্যারেড অফিসার্স কোয়ার্টার্সে যাচ্ছে।

আজ অবশ্য এখনও মকবুল ফেরেনি। ঢোকার মুখেই ব্রিজলাল বলল—

"সাব, আপকা এক ভিজিটার হ্যয়।" অবাক হলাম, কে আসতে পারে? জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় আছে সে। ব্রিজলাল বলল "রিসেপশান রুমমে।"

একটু এগিয়ে ডানহাতে রিসেপশান রুম। আমি হনহন করে এগিয়ে চললাম। মাথায় চিন্তা—কী ব্যাপার? মার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, চিঠিতে জেনেছি। এইসব ভাবতে ভাবতে আমি রিসেপশান রুমে ঢুকলাম।

খুব হালকা, স্নিগ্ধ আলো জ্বলছিল ভেতরে। সেখানে আমি ওকে দেখলাম। বহুদিন পরে। কিন্তু চিনতে পারলাম ঋদ্ধিকে।

প্রদীপ

এত রক্ত কোথা থেকে এল? গলা বেয়ে—মেরুদণ্ড বেয়ে রক্ত ঝরছে। কিন্তু আমি মরে যাইনি, তীব্র বাঁচার ইচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে এখনই উঠে চলে যাই কাছাকাছি কোথাও। সেরকম একটা আশ্রয় আছে বোধহয়, কিন্তু আমি হাঁটতে পারছি না।

লোকটা একেবারে মেরে ফেলল আমাকে! কিন্তু আমি তো ওকে চিনি না। কোনোদিন চোখেও দেখিনি, খালি ওর সঙ্গে যে মেয়েটা ছিল, তাকে চিনতাম, নাম মনে নেই তার—শুধু চোখ মনে আছে। ও আমায় কবে একবার ডেকেছিল। কিন্তু অপেক্ষা করেনি।

এটা বোধ হয় ময়দান। নয়ত এত শীত—এত শিশির কোত্থেকে আসবে কলকাতায়? আমার পিঠে—চিবুকের একপাশে—ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে ঘাস। আমার মৃত মুখের ওপর পড়েছে মাঝরাতের ময়দানে গাছের ছায়া।

তবু মাঝরাতেই ঘুম থেকে উঠতে হয়। অন্ধকার ঘরজুড়ে নানারকম লুকোচুরি চলছে। আগে ভয় করত, কিন্তু এখন বুঝতে পারি যে ল্যাম্পপোস্টের ওই আলো আর ঘরের অন্ধকার লুকোচুরি খেলছে। এরকম সময়ে আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে, সেটার আগুনের সঙ্গে খুব নৈর্ব্যক্তিকভাবে এই সব মেলাবার চেষ্টা করি।

এখন যদি আমি হাসি বা কাঁদি, কেউ দেখবে না। এমনকী আমি যদি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ঘরে ডিগবাজি খাই, কোনো অসুবিধে নেই, অথবা যদি এই ঘরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরে যেতেও চাই, তাহলেও কেউ বাধা দেবার নেই।

কিন্তু এসব কিছুই না করে আমি সিগারেট টানতে থাকি। অবিশ্রান্ত আলো-অন্ধকারের এই খেলার আসরে আমার মনে কোনো সুখের স্মৃতি জাগে না। খালি ভেসে ওঠে যন্ত্রণা, ভীষণ দুঃখ, আর বুকের মধ্যে একটা ফাঁকা-ফাঁকা ভাব। আর হ্যাঁ, অবশ্যই আসে মৃত্যুভয়। একলা—এই অন্ধকারে নিঃশব্দে মরে যাবার কথা মনে পড়ে।

এই শেষ ব্যাপারটাই একটু ভয়ের। আসলে সবটাই তো স্বার্থপরতা। কেউ ফিরে না তাকালে, না দেখলে, কিছু না বললে বেঁচে থাকা অর্থহীন। কিন্তু আরো অর্থহীন মরে যাওয়া।

আমার স্বপ্নটা খুব গ্রোটেস্ক। যাত্রার স্বপ্নের মতো। কিংবা লেডি ম্যাকবেথের ডায়ালগের মতো। কিন্তু বহুদিন ধরে আমি এরকম সব স্বপ্ন দেখছি, যার মধ্যে রক্তপাত-তৃষ্ণা বাঁচার ইচ্ছে এবং অসহায়তা সব আছে। আর সবই নিজেকে নিয়ে। কী কুৎসিত!

"হিয়ার আই অ্যাম—অ্যান ওল্ড ম্যান ইন আ ড্রাই মান্থ। বিয়িং রেড টু বাই আ বয়—ওয়েটিং ফর রেন।" এক শুকনো বুড়োর মুখ মনে পড়ে। সে যেন জৈষ্ঠের দুপুরে তার ক্ষয়ে-যাওয়া বাড়িটার সামনের জঙ্গলে—যা একসময় বাগান ছিল, যেখানে এখন কাঁটাগাছ, বেতগাছ—সেখানে একটা ভাঙা বেদীর ওপর বসে বসে অপেক্ষা করছে, কখন দুপুর শেষ হবে, কখন বৃষ্টি নামবে!

রাত শেষ হতে এখনো অনেক দেরি। কতক্ষণ জেগে থাকতে হবে কে জানে? ক-টা বাজে তাও দেখতে ইচ্ছে করছে না। আমার সাম্প্রতিক স্মৃতির মধ্যে আছে শুধু এক শীতের শেষরাত। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল এরকমই একটা স্বপ্ন দেখে। শীতের মধ্যে জেগে উঠে জল খেলাম। ঘরটা কেমন বদ্ধ মনে হচ্ছিল। জানলা খুলে দিলাম। ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে এল ঘরে। আর তখন আমি দেখলাম সারা রাস্তা জুড়ে পাতলা একটা আলোর চাদর—মিহি সুতোর মতো আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কিছুক্ষণ সব চুপ। তারপর হঠাৎ টিউবওয়েল পাম্প করার শব্দ। ভারিরা জেগে উঠেছে। সেই কবে কলেজ জীবনে একবার এমনই এক শীতের ভোরে হাজারিবাগে জেগে উঠেছিলাম। উঠেই দেখেছিলাম মাঠে আলো পড়ছে। শিশিরে ভেজা মাঠ। মাঝে কিছু ঝোপঝাড়—দূরে আবছা পাহাড়। কী ভালো লেগেছিল বলতে পারব না!

তবে ওই পর্যন্ত। আমি জানি একনাগাড়ে বেশিদিন আমি কলকাতার বাইরে থাকতে পারব না। আমি তো শুধু বিস্তীর্ণ মাঠে ভোরের আলোই দেখিনি, দেখেছি চূড়ান্ত দারিদ্র্যও। তাই এই কলকাতাই ভালো আমার, এখানে থাকলে বিবেকদংশন কম হয়। এমনকি সব ভিখিরিদের, কুষ্ঠরোগীদের দেখেও মেকী বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়া যায়। কিন্তু বাইরে এমন ছড়ানো ভোরে অসহায় চাষীর মুখ দেখলে খারাপ লাগে। তার চেয়ে এই ভালো! কলকাতাকেই

দিয়ে যাব আমার যা কিছু সব। নিজেকে নিংড়ে, শুকনো করে দিয়ে যাব কাশী মিত্রের ঘাটে।

এদিকে এখন প্রায় শেষরাত। প্রায়, কারণ আলো ফোটেনি। কয়েকটা কাক বোকার মতো ডেকে আবার চুপ করে গেছে। আমি মনে মনে ঘুমিয়ে পড়েছি। কিন্তু চোখ দুটো স্থির হয়ে জেগে আছে।

হঠাৎ ঋদ্ধিকে মনে পড়ল। কুয়াশাভরা মাঠ পার হয়ে কোথায় চলেছে ও?

এরপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুম ভাঙতে মুখ-হাত ধুয়ে গেলাম রতনের দোকানে। চা খেতে খেতে খবরের কাগজে চোখ বোলালাম, রোজকার মতোই একঘেয়ে লাগল। রোজই ভাবি সাংঘাতিক কোনো একটা খবর থাকবে, কিন্তু কিছুই থাকে না। সেই এক খরা কিংবা বন্যা, গ্যাস ট্র্যাজেডি, কিংবা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, আমেরিকায় তুলকালাম ইরানগেট স্ক্যাণ্ডাল, বড়জোর একটা ছ-বছরের বাচ্চার পুরো রামায়ণ মুখস্ত বলার খবর। ছেলেটা কী বোকাই না বনছে। এর চেয়ে দাস ক্যাপিটাল বা মেটাফিজিক্স-এর কঠিন তত্ত্ব মুখস্ত করতে পারত। কিংবা দেয়াল থেকে ঝরাতে পারত বিভূতি—আখেরে কাজ দিত। বিকট সিনিকের মতো আমি এই সব চিন্তা করছিলাম, আর এক কাপ চা খেতে খেতে।

কিন্তু সেই সাংঘাতিক খবরটা আজও আমার দেখা হল না। চায়ের পর আমার ঘরে ফেরা। সকালের কাজকর্ম সেরে, স্নান করে, 'তারা' হোটেলে খেতে যাওয়া। খাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি মিনিবাস ডিপোর দিকে গেলাম। যেতে যেতে রোজকার মতো মনে হল, বহুদিন হল আমি ঠিক এই একইভাবে স্কুলে যাই।

নটার এই বাসে প্রায় সবাই সবার চেনা। রোজ নানারকম আলাপ আলোচনা হয়। তার মানে হয় খেলাধুলো, নয় তো অন্যের পেছনে লাগা। এরই মধ্যে হঠাৎ একজন গাইতে আরম্ভ করে রবীন্দ্রসংগীত। সবাই ভীষণ সিরিয়াস হয়ে সে গান শোনে।

একটা জিনিস খুব অদ্ভুত লাগে। লোকে কী করে রবীন্দ্রসংগীতের পদে ভুল করে? হুঁ হুঁ করে বা অন্তরার পদ সঞ্চারীতে জুড়ে সে এক বিকট গান।

স্কুলে আজ আমার চারটে ক্লাস ছিল। ক্লাস নিতে খুব কষ্ট হয়। এই সাধারণ স্কুলটায় ছেলেগুলো একেবারেই গরু-ধরনের। বোকার মতো হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে। কেউ আবার অন্যের পিঠের আড়ালে বসে ঢুলতে থাকে।

প্রথম দিকে আমি খুব উৎসাহ নিয়ে পড়াতাম। ওদের বকতাম। এখন আমিও অন্য টিচারদের মতোই উদাসীন হয়ে গেছি।

এই অসংখ্য গরুর মধ্যে একজন খালি আমার কাছে বিস্ময়। হাফ-ইয়ারলিতে ও চর্যাপদকে চর্চাপদ লিখে বলেছিল যে রামমোহন রায় নাকি চতুর্দশ শতকে তার প্রথম নিদর্শন হিমালয়ে আবিষ্কার করেন। বলা বাহুল্য আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু হিস্ট্রির টিচার সন্তোষবাবু আমাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন এই ছেলেটিই আওরংজের-এর জিজিয়া কর সম্বন্ধে টীকা লিখতে গিয়ে বলেছিল—জিজিয়া রিজিয়ার ছোট বোন এবং আকবরের পিসি।

ছেলেটিকে উতরে দেয়া হয়েছিল।

সবকটা ক্লাস শেষ হয়ে গেলে আমি টিচার্স রুমে বসে এক কাপ চা খাচ্ছিলাম। বেলা সাড়ে-তিনটে। এখন আমার ছুটি। অন্য টিচাররা এই সময় ছাত্র পড়াতে যায়, কিন্তু আমার ভালো লাগে না টিউশান করতে। তাই সময়টা আরো বড় মনে হয়।

আমি শূন্য দৃষ্টিতে এই মলিন ঘরের একটা অনির্দিষ্ট কোণে তাকিয়ে ছিলাম, কিন্তু দেখছিলাম না কিছুই। হঠাৎ বিনয়বাবুর কথায় আমার দুরমনস্কতা কেটে গেল। আমি তাকালাম বিনয়বাবুর দিকে।

এখন এই টিচার্স রুমে বিনয়বাবু আর আমি ছাড়া কেউ নেই। উল্টোদিকে একটা চেয়ারে বসে ভদ্রলোক লটারির টিকিট মেলাচ্ছেন। প্রায় বাষট্টি বছর বয়স—চোখে চশমা, মাথায় কয়েকগাছি পাকা চুল, পরনে জামা আর ধুতি, পায়ে কেড্‌স। বিনয়বাবু হলেন সেই আমলের লোক যখন একটা স্কুলে সবাইকে সবকিছু পড়াতে হত। ভদ্রলোক যতদূর জানি সংস্কৃতে এম-এ, কিন্তু আমি নিজে ওকে ফিজিকাল সায়েন্স-এর ক্লাস নিতে দেখেছি। আসলে সুব্রত চ্যাটার্জি, আমাদের হেডমাস্টার, যখনই দেখেন কোনো মাস্টার আসেনি, তখনই ওঁকে পাঠিয়ে দেন সেই ক্লাস নিতে। ছ-মাস ধরে এক্সটেনশনে আছেন ভদ্রলোক। সব কিছুই মেনে নেন। আমি বহুবার দেখেছি উনি অঙ্কের ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে ইণ্ডিয়ার ম্যাপ আঁকছেন, কখনো বা টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছেন, আর ছাত্রেরা ফুর্তিসে গল্প করছে।

"একটুর জন্যে, বুঝলে রায়, মাত্র পাঁচটা নম্বর" আমার দিকে তাকিয়ে বললেন বিনয়বাবু, মুখে একটা ফ্যালফেলে হাসি।

এরকম প্রায় রোজই হয় ওঁর। নম্বর মেলে না অল্পের জন্যে।

কিন্তু আবার উনি টিকিটগুলো নিয়ে বসে মেলাতে লাগলেন। বাড়ি গিয়েও মেলাবেন বোধ হয়।

আমি একটু দাঁত বের করে উঠে দাঁড়ালাম। এবার যাব। এমন সময় সুখময় ঘোষাল ঢুকলেন।

"হেডমাস্টারের ঘরে আপনার ফোন" বললেন উনি, বেশ হিংস্র ভঙ্গিতে।

"আপনি আবার কষ্ট করে..." এগোতে এগোতে বলছিলাম আমি। কিন্তু উনি থামিয়ে দিলেন—"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি কিছু সেধে খবর দিচ্ছি না—ওখানেই ছিলাম।" বডডো ঝাঁঝালো গলা ভদ্রলোকের! ভাবলাম ওঁকে বলি, "সব ঠিকঠাক চললে আজ আপনি আমার শ্বশুর হতেন।" কিন্তু কিছু না বলে বেরিয়ে এলাম।

সুখময় ঘোষাল আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। আমি জয়েন করার ঠিক পরেই ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে ক্ষেপে উঠেছিলেন। ওঁর একটি হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ, গৃহকর্মে-সূচিশিল্পে নিপুণা, পঃ বঃ দক্ষিণ রাঢ়ী মেয়ে—যে তখনও অবিবাহিতা তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে। খুব ভালো ব্যবহার করতেন আমার সঙ্গে। বাড়িতে নেমন্তন্ন করে দারুণ খাইয়েছিলেন। আমি তখনও ভালো করে কিছু বুঝিনি। খুব ভালো লেগেছিল এই উদার ব্যবহার। এমনকী যখন উনি ওঁর মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, "এ আমার ছোট কন্যা, সুধা। রুইয়ের কালিয়াটা ও-ই রেঁধেছিল" তখনও, মূর্খ আমি, কিছুই বুঝিনি! লক্ষ করিনি যে ঠিক রান্নার পরের সাজ সুধার নয়, সে একটু বেশিই সেজেছে। শ্যামলা একটু ভারিক্কি চেহারার ওই মেয়েটার জন্য আমার পরে বড় খারাপ লেগেছিল। কিন্তু সেদিন আমি কিছুই বুঝিনি।

অন্যান্য বিষয়ের মতো এ-বিষয়েও আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেন সন্তোষবাবু। একদিন টিফিনের সময়, আমি যখন এই ঘরে বসে সুখময়বাবুর আনা (সুধার হাতে তৈরি) বেলের মোরব্বা খাচ্ছি, ঘরে কেউ নেই, তখন সন্তোষবাবু বেশ কুটিল, প্রতিহিংসাপরায়ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"আর কী মশাই। আপনি তো ঘোষালের জামাই হতে চলেছেন!" —মুহূর্তে বিস্ফোরণ হল ঘরের মধ্যে। হা হস্ত! বেলের মোরব্বা আমার জিভের মধ্যে চিরতার রস হয়ে গেল—কোথায় তার সুধা! অমি জিগ্‌স পাজলের সব কোণগুলি চট করে মিলিয়ে নিতে পারলাম। আমার প্যালপিটেশন বেড়ে গেল।

পরদিন বিকেলেই আমি পরোক্ষভাবে সুখময়বাবুকে জানিয়ে দিলাম, বিয়ে

করার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। অন্তত এখন নয়। সঙ্গে সঙ্গেই মুখভঙ্গি বদলে গেল সুখময়বাবুর। নগেন মল্লিক ক্লাসে ছেলেরা ট্রান্সলেশানে ভুল করলে যেমন হিংস্র হয়ে ওঠেন, তেমনি হিংস্র হয়ে উঠল ওর মুখভঙ্গি। সিগারেটের ধোঁয়া আমার গলায় আটকে এসেছিল ওঁর সেই উগ্রচণ্ড রূপ দেখে!

এই শত্রুতার শুরু সেখানেই। এরপর কতবার, নেহাত বিনা কারণে ভদ্রলোক যে আমার অপমান করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গেলাম হেডমাস্টারের কোণের ঘরে। ঢুকে পড়লাম। মাঝবয়েসি সুব্রত চ্যাটার্জি ভালো ছাত্র ছিলেন—এছাড়া রাজনৈতিক যোগাযোগও বেশ ভালোই। তাই উনি হেডমাস্টার। ভালো মানুষ। কথা কম বলেন, কিন্তু মেকী গাম্ভীর্য নেই। শিক্ষিত—সংযত।

"আপনার ফোন—" বললেন একটু মাথা তুলে।

"থ্যাঙ্ক ইয়ু"—বলে একটু হেসে আমি রিসিভার তুললাম। উনি আবার কাজে মন দিলেন।

"হ্যালো"—আমি খালি এই বলেছিলাম। তারপর সব শুনে গেছি। ত্বিষা অনর্গল বলে চলেছিল—"হ্যালো প্রদীপ, শোন, আজ শুভ্রর চিঠি এসেছে। সাংঘাতিক খবর—ঋদ্ধি ওর কাছে আছে। গত সপ্তাহে গেছে—বুঝলি? শুভ্র আমায় যেতে লিখেছে। তুই যাবি প্রদীপ আমার সঙ্গে? কতদিন বাদে বল্, তাছাড়া ও তোকে দেখলে কত খুশি হবে ভাব, অ্যাঁ? তাহলে কাল হাওড়ায় সাতটা কুড়ির গাড়িতে, কেমন? আমি বড় ঘড়ির নিচে দাঁড়াব এই ছটা নাগাদ... ঠিক আছে? আসিস কিন্তু। ওঃ প্রদীপ, তুই ভাবতে পারিস না আমার কেমন লাগছে! তাহলে কাল ঠিক পাঁচটা—অ্যাঁ..."

হেডমাস্টারের ঘরের বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজল।

ত্বিষা

খাটের ওপর শুভ্রর চিঠি। তার মধ্যে থেকে ঋদ্ধির মুখ উঁকি দিচ্ছে। আমার সময় আর কাটছে না। এখনও পাঁচ ঘণ্টা বাকি আছে ভোর হতে। রোজকার মতো আজও অফিস গিয়েছিলাম। এখন ঘুম পাবার কথা। কিন্তু আজ আমি ঘুমোতে পারব না—চাইও না ঘুমোতে।

শেষ পর্যন্ত শুভ্রর কাছে গেল ঋদ্ধি! শুভ্র যে ওর খুব ভালো বন্ধু ছিল এমন নয় বরং শুভ্র আমার দিকে ঝুঁকেছিল জেনে একটু রাগ থাকাই সম্ভব। রাগ! না-না-ঋদ্ধি অত হিংসুটে ছিল না! তাছাড়া আমি তো কখনও কোনো বেচাল ব্যবহার করিনি শুভ্রর সঙ্গে। উঁহু—কখনো না! শুভ্র নিজেও বলতে পারবে না! বরং যেদিন আমি প্রথম বুঝলাম যে শুভ্র আমার কাছে বন্ধুত্বের বাইরেও কিছু চায়, সেদিন থেকেই আমি ভেতরে ভেতরে তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। বাইরে আরো বেশি স্বাভাবিক ব্যবহার করতাম ওর সঙ্গে। কিন্তু কখনও ওকে একা হবার সুযোগ দিইনি আমি।

একবার মনে আছে আমরা সবাই মিলে "গান্‌স অব নাভারনা' দেখতে গিয়েছিলাম নিউ এম্পায়ারে। তখন আমি ইউনিভার্সিটির হস্টেলে থাকি। শো ভাঙতে রাত সোয়া ন'টা হয়ে গিয়েছিল। আমাকে হস্টেলে পৌঁছে দিতে নিজেই গরজ দেখিয়ে এল শুভ্র। আমি জানি, যদি সামান্য একটু এদিক-ওদিক করতাম আমার কথায়—ব্যবহারে, তাহলেই শুভ্র একান্ত হবার চেষ্টা করত। কিন্তু আমি খুব স্বাভাবিক ছিলাম—বড় বেশি স্বাভাবিক। অন্যান্য দিনের মতোই ইয়ার্কি মারছিলাম, ওকে কোনো ভারী কথা বলার সুযোগই দিইনি।

কিন্তু তখনও তো ঋদ্ধির সঙ্গে আমার প্রেম হয়নি।

হয়েছিল অনেকদিন পরে। ষোলই জানুয়ারি, আমার মনে আছে দিনটা!

এমনিতে আমার ঋদ্ধিকে খুব ভালো লাগত। আমি কোনোদিনই অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ ছিলাম না। অন্যান্য মেয়েদের মতো আমিও চাইতাম অনেকের সঙ্গে একটি বিশেষ পুরুষের আকর্ষণ। শুধু কি তাই? শরীরেও ছোঁয়াও কি

নয়?—হ্যাঁ তাও। কিন্তু আমি এই ব্যাপারটাকে লাগামছাড়াভাবে রোমান্টিকালি ভাবতাম না।

আমার কল্পনার যে পুরুষটি—তার সঙ্গে ঋদ্ধি পুরোপুরি মেলে না—পৃথিবীর কোনো মানুষই মেলে না বোধহয়; তবে ঋদ্ধি ছিল তার সবচেয়ে কাছাকাছি। তাই ঋদ্ধি যখন একটু বেশি সময় আমার সঙ্গে কাটাতে চাইত, আমি আপত্তি করতাম না,—আমার মনে হচ্ছিল কিছু একটা ঘটবে।

সেদিন—ষোলই জানুয়ারি আমাদের বি. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। মন্দ করিনি আমি। ঋদ্ধি ছিল আমার থেকে দু-বছরের সিনিয়র। ওর এম. এ. পরীক্ষাও তখন সামনে। আমি আর ঋদ্ধি ক্যাম্পাসের মাঠে সেদিন গল্প করছিলাম, তখন চারটে বাজে বোধহয়। ঋদ্ধি পরেছিল একটা অফ-হোয়াইট গেঞ্জি আর নীল একটা জিন্‌স। ঋদ্ধি বলছিল—অনেকক্ষণ ধরেই—যে আমার ওকে ট্রিট করা উচিত? শেষে হঠাৎ আমি বলে উঠেছিলাম—"হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?"—ঋদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠেছিল—'ইউ'—আমি জানতাম এরকম হতে পারে। কিন্তু তবু থমকে গিয়েছিলাম ওর এই সোজাসুজি উত্তরে। চুপ করে ছিলাম আমি :

"হোয়ট ডিউ থিংক?"—ঋদ্ধি সাহেবি কায়দায় জানতে চেয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম, ও নার্ভাস হয়ে গেছে। জোরে জোরে টানছে সিগারেটটা।—আমি চুপ করে থেকেছিলাম।

"সি ত্রিষা—ইফ ইয়ু হ্যাভ এনি অবজেকশান—কোনো প্রবলেম নেই, বলে ফ্যালো। জাস্ট ডোণ্ট কিপ শাট।" আমি কী বলব? স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। তবু আমি মাথা নিচু রেখেই বললাম—

"আই ডোণ্ট নো..."—কিন্তু আমার গলায় জোর ছিল না।

ঋদ্ধি বুঝেছিল। তাকিয়েছিল আমার দিকে—একদৃষ্টে। ওর চোখের কোণে চিক্‌চিক্ করছিল ধারাল হাসি। ও বলেছিল—"ঠিক আছে, পরে শোনা যাবে।—ইয়ু নিডণ্ট সে রাইট নাও।...

সেদিন রাতে আমরা বাইরে খেয়েছিলাম। আমার উত্তর পেয়ে গিয়েছিল ঋদ্ধি।

উঃ—ষোলই জানুয়ারি! ভাবলেই আমার কেমন যেন লাগে! আনন্দে শিউরে ওঠে বুকের ভেতরটা! বিয়ের পরও আমি কতবার ঋদ্ধিকে বলেছি, "জানো, আমার খুব ফিরে পেতে ইচ্ছে করে ষোলই জানুয়ারি!"

"কেন, এখন কি আমরা ভালো নেই?"—আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলত ঋদ্ধি।

"জানতাম তুমি বুঝবে না! ইডিয়েট কোথাকার!"—আমি ফুঁসে উঠতাম।

আমার রাগ খুব ভালো লাগত ঋদ্ধির! আমাকে আর কথা বলার সুযোগ দিত না!

সেই ঋদ্ধি চলে গেল। আবার ফিরে এল অনায়াসে—ফিরে এল এমন একজনের কাছে, যে ওর তেমন বন্ধু ছিল না। কী হয়েছিল ঋদ্ধির? কোথায় ছিল ও?— ছটফট করছি আমি। এক্ষুণি সব প্রশ্নের উত্তর চাই!

ঋদ্ধিকে দেখব—কতদিন পরে ওকে দেখব আবার! আচ্ছা, ওকে আমি প্রথম কথা কী বলব? বকব কি? নাকি তাকিয়ে থাকব ওর দিকে? ওকি এগিয়ে আসবে না আমায় বুকে টেনে নিতে?—আমার তো ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করবে ওর ওপর!

কত বাকি রাত শেষ হতে? এখনও অন্ধকার। আচ্ছা, প্রদীপ আসবে তো? এলে খুব ভালো হয়। নাহলে পুরো জার্নিটা আমি টেনশানে শেষ হয়ে যাব। তাছাড়া একা একা অতদূর..!

আমি উঠলাম। কফি বানিয়ে খাব। ঘুমোব না। আজ বাকি সময় আমি জেগে থাকব। ঋদ্ধির কথা ভাবব। ওর সমস্ত পুরনো চিঠি, ছবি বের করে দেখব আমি। তারপর কাল দুপুরে ওকে প্রথম দেখব। কাল কি ষোলই জানুয়ারি? আবার কি ষোলই জানুয়ারি কাল? —না, তা-তো নয়!

কে বলেছে নয়? —কালই তো ষোলই জানুয়ারি!

দ্বিতীয় পরিচয়

১

ও আমাকে লক্ষ করছে। আমি জানি। এ-কদিনে ওর মুখে চোখে আমি একটা প্রশ্নচিহ্ন ঝুলতে দেখেছি। ওর দোষ নয়। এইতো স্বাভাবিক। তবে এ-ও ঠিক যে আমায় দেখে ওর চোখ আর ঠিকরে ওঠে না, যেমন উঠেছিল প্রথম দিন। সেই যেদিন সন্ধেবেলা ওদের রিসেপশান রুমে আমায় দেখল শুভ্র। যাকে বলে থাণ্ডারস্ট্রাক, ওর সেই অবস্থা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, "এলাম। কয়েকটা দিন থাকব এখানে। তোর কোনো অসুবিধে হবে?" খুব স্মার্ট শুভ্র। নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল—"না-না! অসুবিধে কীসের? থাক না যদ্দিন খুশি!"—বলে একটা সোফায় বসেছিল।

এর পরেই আমাদের দুজনের মাঝখানে একটা বোবা পর্দা নেমে এল। শুভ্রই কাটাল সেটাকে। বলল—"তোর খবর কী বল?"

"তুই নিশ্চয়ই জানিস"—আমি বললাম। শুভ্র চুপ করে থাকল। আমি জুড়ে দিলাম—"আই অ্যাম ল্যাজারাস—কাম ফ্রম দ্য ডেড।"

শুভ্র খুব মিষ্টি হেসে ওর সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি একটা নিলাম। শুভ্র লাইটার জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিল। নিজেরটা ধরিয়ে ও বলল—"আমি তোকে এমব্যারাস করতে চাইনা।"

আমি বললাম, "সেজন্য ধন্যবাদ। তবে আমার আরো একটা ফেবার চাওয়ার আছে।" শুভ্র কিছু না বলে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম—"তুই আমাকে কিছু জিগ্যেস করতে পারবি না। নাথিং রিগার্ডিং লাস্ট-থ্রি মান্থস।"

শুভ্র উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল—"ঘরে চল।"

আমি উঠলাম না,—"তুই উত্তর দিলি না?"

শুভ্র বলল—"কী উত্তর? তুই তো জানিস।"

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে চললাম ওর সঙ্গে।

শুভ্রর ঘরটা খুব আরামের। ও হাত বাড়িয়ে টিউবটা জ্বালাল। আমার হাত থেকে সাইডব্যাগটা নিয়ে ঘরের এক কোণে আলনার গায়ে টাঙাল। ওয়ার্ডরোব খুলে দুটো পরিষ্কার পাজামা বের করল। একটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। তারপর ঘরের বাঁ দিকে একটা ছোট দরজা খুলল, খুট্ করে শব্দ হল। আমাকে বলল, "ভেতরে যেতে পারিস, ইফ ইয়ু ফিল লাইক। টাওয়েল আছে ওখানে।"

একটু বাদে আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি শুভ্র ঘরে নেই। আয়নার সামনে গেলাম। ফুটে উঠল নিজের মুখ। অনেকদিন পর দেখলাম আমি। গালভর্তি দাড়ি। গালে একটা নীল শিরা ফুলে রয়েছে। আমি আগের চেয়ে কালো হয়েছি। চোখের নিচে কেমন কালচে দাগ। কি ঋদ্ধি হোয়ট ডু ইউ ফিল লাইক, ওল্ড চ্যাপ? এখানে কদিন থাকবে? কত টাকা আছে হিসেব করবে একবার? নাকি কাল? শুভ্র অফিস চলে গেলে, অ্যাঁ?

খুব গুনগুন করে এসব কথা বলছিলাম আমি। দরজার বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে চুপ করলাম। মাথা আঁচড়ে নিলাম শুভ্রর চিরুনি দিয়ে।

"খাবার ব্যবস্থা করে এলাম। তুই রিল্যাক্স কর—আমি এক মিনিট আসছি।"

বাথরুমে ঢুকল শুভ্র। আমি ওর খাটে গিয়ে বসলাম। বেশ বড় খাট। তিনজন অনায়াসে শুতে পারে। বালিশের পাশে একটা পেপারব্যাক—দ্য বোর্ন আইডেনটিটি—আমি পেছনের লেখাটা পড়তে থাকলাম। ভালো লাগল না। তাই চোখ বুঁজলাম।

চোখ বুজতেই ট্রেনের দুলুনি টের পাচ্ছিলাম। গত সাতদিন বেশির ভাগ সময় ট্রেনে কাটানোর ফল। তবে আমি ঝিমোতে চাইছিলাম না। তাই চোখ খুলে সিলিং দেখতে লাগলাম, পরিষ্কার সাদা দেয়াল। একটা টিকটিকিও নেই। এরকম একটা পরিচ্ছন্ন জায়গায়, এরকম পরিষ্কার জামা-পাজামা পরে কদ্দিন থাকা হয়নি?—তিন মাস এগার দিন আজ নিয়ে। তার আগে?

দরজা খুলে বেরিয়ে এল শুভ্র। ও শেভ করে স্নান সেরে এসেছে।—"তুই কি খুব ভোরে যাস?" আমি জিগ্যেস করলাম। তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে তাকাল একবার আমার দিকে। "কী করে বুঝলি?"—আয়নার সামনে গিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল ও।

"এখন শেভ করলি, তাই।"—বললাম।

"বাট মাই ডিয়ার ওয়াট্‌সন—ইয়ু আর অ্যাবসল্যুটলি রাইট।"—গলা তুলে বলল শুভ্র। আমরা দুজনেই হাসলাম।

কিন্তু যেটা এইসব কথাবার্তা আর হাসিঠাট্টার মধ্যে থেকেও বেরিয়ে আসছিল

সেটা হল ওই নোট অব ইন্টারোগেশন—শুভ্রের মুখের ওই নিঃশব্দ প্রশ্ন। কী ভালো হত যদি আমি ওকে সবকিছু বলতে পারতাম! কিন্তু কী বলব আমি? আমার গত কয়েকমাসের অদ্ভুত ছন্নছাড়া ওয়াণ্ডারথার্স্ট-এর মানে কি আমি নিজেই বুঝতে পেরেছি?

তবে শুভ্রর সংযম দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। ও-আমাকে কিছুই জিগ্যেস করছে না, এমনকি কলেজ জীবনের কথাও নয়। কারণ তাহলেই তো ত্বিষার কথা এসে পড়বে। কী করবে তখন শুভ্র? তাই আমরা প্রায় কোনো কথাই বলি না। বলার মতো বিষয় নেই কিছু। রাতে শুভ্র ফিরে এসে স্নান করে ড্রিঙ্ক করতে শুরু করে। আমি একটা পেগ্ নিয়ে ওকে সঙ্গ দিই। কিছুক্ষণ বাদে রাতের খাওয়া সেরে নেয় শুভ্র। ঘুমিয়ে পড়ে। আমি নিঃশব্দে লাগোয়া বারান্দায় আসি। বেতের চেয়ারে বসে অন্ধকার দেখি।

খুব নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মাঝে মাঝে দূরে কিছুক্ষণ ট্রেনের শব্দ—তারপর আবার সব চুপ। এগারটা পর্যন্ত তবু আশেপাশের দু-একটা ঘর থেকে চেঁচামেচি, অল্প মাতলামি আর গানের শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু তারপর আবার সব চুপ। এই চুপ হয়ে যাওয়াটাই অন্ধকারকে আরো বাড়িয়ে দেয় যেন। যেন রাশি রাশি অন্ধকারের জন্ম হচ্ছে। আমি বসে থাকি। একটুও নড়াচড়া না করে। শুধু এই অন্ধকার দেখি—কিছু ভাবি না।

সকালে শুভ্র বেরিয়ে যাওয়ার অনেক পরে উঠি আমি। শুভ্র ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আটটা নাগাদ আমার চা আর ব্রেকফাস্ট ক্যান্টিন থেকে দিয়ে যায় ব্রিজমোহন। ওসব খেয়ে আমি কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটু বেড়াই। বুঝতে পারি কোনো কোনো বারান্দা বা জানালা থেকে কেউ কেউ—বেশিরভাগই বিভিন্ন বয়সের মেয়ে—আমাকে লক্ষ করছে। আমি কি এদের কাছে রহস্যময় এক আগন্তুক? নাকি এখনও খুব সুদর্শন আমি? বোধ হয় দুটোই। আমি অল্প হাসি। ওরা কি সেটাও লক্ষ করে? তবে তো আমি পাগলও!

কেয়ারটেকারকে বোধহয় শুভ্র বলে গেছে আমার দিকে একটু নজর রাখতে। বেচারা প্রাণপণে চেষ্টা করে ধরা না পড়ার। কিন্তু ওর নিটোল দেহাতি সারল্যে সেটা পারে না। তাই আমি যখন একটু দূরে গিয়ে ফিরে দেখি যে ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তখন ও একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

কাল আমি ওর সঙ্গে একটু খেললাম। শুভ্রদের কোয়ার্টার্সের সামনে যে পাম্পহাউস, তার চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা ফাঁকে লুকিয়ে পড়লাম।

সেখান থেকে আমি লোকটাকে লক্ষ করতে লাগলাম। আমায় না দেখে ও প্রথমে অপেক্ষায় রইল। মিনিট পাঁচেক। তারপর উস্‌খুশ্‌ করতে লাগল। শেষে আর না পেরে একসময় হেঁটে হেঁটে এদিকেই আসতে লাগল। ও যখন প্রায় এসে পড়েছে তখন আমি হঠাৎই আমার গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে একেবারে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। বেচারা ভীষণ চমকে গেল। আমি ওর কাঁধে একটা হাত রেখে সিগারেটের প্যাকেটটা ওর সামনে খুলে বললাম—"চিন্তা মত কিজিয়ে—হাম ইত্‌নি জল্‌দি ভাগনেবালা নেহি।"

দুপুরে শুভ্র একবার আসে। তখন আমরা এক সঙ্গে লাঞ্চ করি। মাঝে মাঝে ও বলে—"কী করিস সারাদিন?" আমি বলি—"এই, এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াই—বই পড়ি। ক্ষিদে পেলে খাই।" শুভ্র বুঝদারের হাসি হাসে। এক ছুটির দিনে ওর স্কুটারে চেপে আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম। মাইল পাঁচেক দূরে—একটা পাহাড়ি নদীর পাশে। সুন্দর জায়গাটা। ছায়াঘেরা—নদীর জল পরিষ্কার—দু-একটা টিলা কাছে-দূরে। মোষের পিঠে দেহাতি বাচ্চা—ড্যাবডেবে চোখে আমাদের মদ খাওয়া দেখছে। একেবারে পাস্টোরাল সিন। তবে ভালো নয়। এমন খাঁ খাঁ শূন্য ভালো নয়। অনেক কিছু মনে পড়ে।

ত্বিষার কথা মনে পড়ে। এই তিন মাস সতের দিন রোজ আমি ওর কথা ভেবেছি। ও কি বিশ্বাস করবে সেই কথা? ওর জন্যে আমার খুব চিন্তাও হয়েছে। তবু যা করার আমি কিছুই করতে পারিনি। এমনকী একটা চিঠিও লিখে আসিনি ওকে। একদিন—হঠাৎই—বেরিয়ে পড়েছিলাম।

খুব দূরে যাইনি কোথাও। জানতাম দূরে গেলেই ধরা পড়ব তাড়াতাড়ি। তাই কখনও রাঁচি, কখনও চাঁইবাসা, কখনো বা একেবারে অন্যদিকে—চাঁদিপুরে—কাটিয়েছি এতগুলো দিন। কেমন কেটেছে আমার? আঃ! প্রথম দিনগুলো যেন ক্যানসার! এক গোঁয়াটে যন্ত্রণা বুকে-মাথায়! আমি কি উদাসীন হতে পেরেছিলাম? পারতাম কোনোদিনও? রাতে মাঝে মাঝে গোঁ-গোঁ শব্দ করে জেগে উঠতাম। উঠে বুঝতাম, পাশে কেউ নেই। খালি নিরেট অন্ধকার। তখন কোনো কোনো দিন কি ত্বিষার কথা ভেবে কাঁদিনি আমি? চাইনি কি ওকে ছুঁতে?—এ আমার পুরনো অসুখ। ত্বিষা জানত। এরকম রাতে ও আমাকে জাগিয়ে দিত। বারণ করত বুকে হাত দিয়ে চিৎ হয়ে ঘুমোতে। ত্বিষা—সেই অসম্ভব ইন্টেলিজেন্ট ত্বিষা! পরদিন সকালে হাসতে হাসতে আমি বলতাম—তুমি এমন অদ্ভুত কী করে হলে বলত? তোমার নাকি কোনো

সংস্কার নেই? তবে তুমিও কি ভাব আমায় বোবায় ধরেছে?—ত্বিষা একটু অপ্রস্তুত হত। কিন্তু উত্তর দিত না। আর একই কাজ করত। মাঝে মাঝে ত্বিষার শরীরের কথা মনে পড়ে আমার। আর মনে পড়লেই ভেতরে একটা ছটফটানি চলতে থাকে। কিন্তু তার পরে—তারও পরে?

এ ক মাস আমি ছিলাম অ্যাবস্কণ্ডার। যত পেরেছি পুলিশের পাশ মাড়াইনি। জানতাম ত্বিষা ওখানে যাবেই। এখন তিন মাস বাদে মনে হচ্ছে লুকিয়ে থাকার মতো সোজা কাজ আর কিছু নেই। যদি পকেট ভারী থাকে।

কিন্তু টাকা ফুরিয়ে যেতে লাগল। শেষে ট্রেনে-ট্রেনেই দিন কাটানো শুরু করলাম। রাতের ট্রেন ছুটত—জানলার পাশে বসে দেখতাম হু-হু করে বিরাট জ্যোৎস্না নিয়ে একটা মাঠ ছুটে যাচ্ছে—আসছে ঠিক ওরকম আর একটা মাঠ—ঝুপসি গাছ। আমার মনে পড়ত আমরা হানিমুন করতে যেবার গাদিয়ারা যাই সেবার ঠিক এমনই চাঁদ উঠেছিল। মানে ওঠে নিশ্চয়ই চিরদিনই। কিন্তু এত মন দিয়ে দেখিনি। তখন ত্বিষা আমার সঙ্গে ছিল।

শেষে একদিন এখানে। টাকা শেষ প্রায়। এখানে আসার বিপদ জেনেও আসতে হল। জানতাম ত্বিষা খবর পাবে। কিন্তু কী করব? আর কোথায় যাব আমি?

শুভ্র আমার তেমন বন্ধু ছিল না কোনোদিনই। তার ওপর আমি জানতাম যে ত্বিষার প্রতি ওর একটু স্পেশাল অ্যাটেনশান ছিল। আমি ত্বিষাকে তাই নিয়ে রাগাতাম। আর ত্বিষা তখন...

নিশ্চয়ই শুভ্র চিঠি দিয়েছে ত্বিষাকে। এখন এই শেষ দুপুরে—বারান্দায় বসে আমি অন্যান্যদিনের মতোই ভাবছি—কী হবে এবার? হোয়াট আ শোডাউন! ত্বিষা, শুভ্র—হোয়াট আ ..

কিন্তু আর আমি কোথাও যাব না। খুব টায়ার্ড আমি। যদি ত্বিষা আসে? যদি নয়—ও আসবেই। তখন?

আমি জানি না। আমি ক্লান্ত। কী বলব ত্বিষাকে—আমি জানি না—আমি আর ভাবব না! কত ভাবব আর?

২

সমস্যাটা কোথায় শুভ্র জানে না। তার কৌতূহল হয়। প্রকাশ করে না দুটো কারণে। প্রথমত, এতদিনের শিক্ষা, রুচিবোধ। দ্বিতীয়ত, এক ভয়, যদি ঋদ্ধি চলে যায়! এই কদিনের মধ্যেই কীভাবে এক অদ্ভুত নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে

পড়েছে সে। তাও তো ক্লাইম্যাক্স এখনো আসেনি। এলে নিজের ভূমিকাটা কল্পনা করতেও ভয় পায় শুভ্র।

তার নিস্তরঙ্গ, একঘেয়ে জীবনে ঋদ্ধি কোনো বৈচিত্র্য নিয়ে আসেনি। বরং একটা অস্বাভাবিক থমথমে ভাব থাকে শুভ্রর মনে—যখন রাতে তারা মুখোমুখি হয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কথা চলতে পারত যে সময়টা নিয়ে, সেই অতীতে কোনো একটা সময় এমন কিছু ঘটেছে ঋদ্ধি-ত্রিবার জীবনে, যা নিয়ে কোনো কথা বলা চলে না। অনেক ভালো হত যদি ঋদ্ধি সব খুলে বলতে পারত তাকে। অনেক সহজ স্বাভাবিক হয়ে যেত তাদের সম্পর্ক। শুভ্রর ভালো লাগত।

বেলা দুটো নাগাদ আবার ফ্যাক্টরিতে ফিরতে ফিরতে ভাবছিল সে। এতক্ষণ খেতে খেতে তারা কিসব অদ্ভুত বিষয় নিয়ে কথা বলছিল! ছোটবেলার আবছা ঘটনা। ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কারদের বদমাইশি। ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে গত ক'দিন ধরে এই একই ধরনের সংলাপ চলছে। বেশিক্ষণ কথা চালানো যায় না, মুখ বিষিয়ে যায়, জোর ক'রে হাসতে হাসতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়—তবু বলতে হয়। না হলে যে সাংঘাতিক নিস্তব্ধতা নামে, সেটাকে সে সহ্য করবে কী করে?

এ-কদিনে শুভ্র একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে বিয়ে করবে না। অন্তত এখানে—এই চাকরিতে থেকে কিছুতেই নয়। কী নিয়ে কথা বলবে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে? প্রথম ক'দিন শরীরই সব কথা বলবে। তারপর?—তারপর সে জানে যে তার বউ—সে যেই হোক না কেন—আস্তে আস্তে সুলেখা বাজপেয়ি, টিকলি চৌদ্রি বা ডেভি হয়ে যাবে। বোধবুদ্ধিহীন একটা রঙিন জীব। এই বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকায়—শাল-মহুয়ার বনের মধ্যে চাকরি ছাড়া কিছুই করার নেই। মানুষগুলোর সঙ্গে মেশা যায় না এত খেলো ওদের কথা বলার ধরন, পোশাক, সেন্স অব হিউমার। শুভ্র জানে, সে আর বেশিদিন পারবে না। হয় ওকে চাকরি ছাড়তে হবে, নয়তো বিরজুপ্রসাদ, বা দীনেশের মতো অফিস-পার্টি-জুয়া-মদ নিয়ে থাকতে হবে। গতকাল রাতে সে আর সহ্য করতে পারেনি।

দীনেশ উপাধ্যায়ের ম্যারেজ-পার্টি ছিল কাল। এতদিন এখানেই থাকত দীনেশ। কানপুরের ছেলে। বেশ চটপটে। শুভ্রর মন্দ লাগত না ওকে। হঠাৎ শোনা গেল দীনেশ বিয়ে করছে। কাকে? কাকে? চারদিকে গুঞ্জন। একদিন ক্লাবে যেতে মিসেস করকরিয়া জানাল যে বেটিকে বিয়ে করছে দীনেশ।

কেটি প্রোডাকশান ম্যানেজার জগদীশ পাণ্ডের মেয়ে। এখানকার অন্যান্য সব মেয়েদের মতোই। কিন্তু শাড়ি পরে—খুবই মারাত্মক ভাবে যদিও—তবু পরে। জে. এন. ইউ থেকে পলিটিকাল সায়েন্স নিয়ে কোনোরকমে বেরিয়ে গেছে। সে ভীষণ "এথ্‌নিক"। তার শোবার ঘরের প্রশংসা আর নিন্দে দুই-ই শুনেছে ক্লাবে মহিলাদের কাছে। সে নাকি মাটিতে মাদুর পাতে। সারা ঘরের দেয়ালে নিচের দিকে অজস্র বই তার। আকাশের রঙ দেখে সে ঘরের পর্দা পাল্টায়। ঘরে নাকি চারটে বিশাল অয়েল পেন্টিং আছে। একটা আবার নন্দলালের আঁকা। সব দেশি—বেটি খুব "এথ্‌নিক"।

বেটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার। বেটি কিছুতেই ইংরেজি বলে না—কিন্তু হিন্দি বলে অদ্ভুত অ্যাকসেন্‌চয়েট করে শুভ্রকে বোধহয় ভালো লেগেছিল বেটির। দু-একবার ইনভাইটও করেছিল বাড়িতে। কিন্তু শুভ্র বুঝেছিল, এ-মেয়ে আরো বিপজ্জনক। তাই এড়িয়ে গেছে। সেই বেটির সঙ্গে দীনেশের বিয়ে—এরকম শুনেছিল শুভ্র। কিন্তু পরে দেখা গেল—ব্যাপার অন্যরকম। মাসখানেক আগে দীনেশ চলে গেল তার কানপুরের বাড়িতে। এই সেদিন ফিরে এল স্মিতাকে নিয়ে। তার বউ। শোনা গেল—বাড়ি থেকে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছে। এ-ও শোনা গেল যে দীনেশের বাবা নাকি আশি হাজার টাকা পণ নিয়েছে। কিন্তু বেটি? ব্যাপারটা বুঝল না শুভ্র। কোনোরকম কৌতূহল-ও দেখায়নি সে। সবাই তাহলে কেচ্ছা গাইতে শুরু করবে।

পরশু অফিসে গিয়ে শুনল দীনেশ পার্টি থ্রো করছে। এটা কিছুতেই এড়ানো যাবে না জেনেও শুভ্র চেষ্টা করেছিল না যেতে। দীনেশকে সে বলেছিল, "আই হ্যাভ আ ফ্রেণ্ড উইথ মি।"

দীনেশ বলল—"হোয়ায় ডোনট্‌ ব্রিং ইম অ্যাল? টেল হিম হি ইজ অলসো ইনভাইটেড। অর শ্যাল আই গো অ্যাণ্টেল হিম মায়সেল্‌ফ?"

শুভ্র দেখল আরো বিপদ। কারণ ঋদ্ধি কিছুতেই আসবে না। আর এলে আরও মুশকিল। অনেক কিছু ঘটে যাবে এক রাতের মধ্যে। তাই সে বলেছিল যে ইনভিটেশানের দরকার নেই—সে যাবে।

কাল রাতে গিয়েছিল। অফিস থেকে ফিরে কাঁচা খিস্তি করতে করতে তৈরি হচ্ছিল যাবার জন্য। তার অবস্থা দেখে ঋদ্ধি হাসছিল। সেই কলেজ জীবনের মতো হো হো করে হাসছিল ঋদ্ধি। ভালো লাগছিল শুভ্রর। সে বলেছিল—'হাস্‌-হাস্‌ শালা! খুব ফুর্তি, না? দাঁড়া। এর পরের পার্টিতে

আমি তোকে নিয়ে যাব। তখন বুঝতে পারবি—দেন ইউল সি এভরিথিং ক্লিয়ারলি!"

অন্যান্য দশটা পার্টির মতোই এক দৃশ্য। শুধু ব্যতিক্রম এই যে হল-এর ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু চেয়ারে সুমিতা, দীনেশের বউ, বসে ছিল। এত গয়না পরেছিল সে যে ভালো করে মুখও তুলতে পারছিল না। এটা বোঝা যাচ্ছিল যে মেয়েটি অন্যদের মতো নয়। এই নিয়ে ডেভি-সুসরা খুব হাসছিল আড়ালে। হাসছিল তাদের মায়েরাও। দীনেশ একটা সিল্কের পাঞ্জাবি আর চোস্ত পরে খুব হন্তদন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। লোকজনকে নিয়ে আলাপ করিয়ে দিচ্ছিল সুমিতার সঙ্গে। এখানে রসিক বলে পরিচিত দেবদাস বেনার্জি সুমিতাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখে তারপর দীনেশের কানে কানে বেশ জোরেই বলল—"সো প্রিটি আ গার্ল—ইউ আর শুয়া শি ইজ ইওর ওয়াইফ?" সবাই হো হো করে হাসল। সুস এসে বেনার্জির হাত চেপে ধরে বলল "হি ইজ সো কিউট না!" পঞ্চাশোর্ধ্ব থলথলে বেনার্জি সুসের শরীরের খোলা জায়গায় ক্যাজুয়ালি হাত বোলাতে বোলাতে তাকে কীসব বলতে লাগল। ওদিকে তখন বেনার্জির রঙিন বউয়ের মুখ গম্ভীর হচ্ছে।

এ-সব ঠিকই ঘটে চলছিল। প্রতিবারই এমন হয়। যথাসময়ে ড্রিঙ্কস সার্ভ করা হল। অবস্থার সুযোগ নিতে সবাই দু-এক পেগ খেয়েই মাতাল হয়ে যেতে লাগল। শুভ্র অন্যান্যবারের মতোই ডেভিদের ইঙ্গিত এড়িয়ে এক কোণায় বসে সদাশিবজীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সদাশিবজীর চাকরি আর অল্পদিনই বাকি আছে। বিপত্নীক মানুষ। এক ছেলে অ্যামেরিকায় সেটল করেছে। ওঁরও ইচ্ছে রিটায়ারমেণ্টের পরে ছেলের কাছে চলে যাবার। বছরে একবার ছেলে বিজয় আসে। বাবাকে নিয়ে বেড়াতে যায়। তারপর সদাশিবজী আবার একা। সন্ধ্যাবেলায় ওঁর কোয়ার্টারের আবছা অন্ধকারের দিকে তাকালে ভয় করে শুভ্রর। সে ভাবে, এখন ঘরে একা বসে কী করছেন ভদ্রলোক? যদি হঠাৎ শরীর খারাপ করে—যদি সকালে উঠে মনে হয় দম বন্ধ হয়ে আসছে—সারা গা ঘামছে দরদর করে? কী হবে?

শুভ্রর খুব জানতে ইচ্ছে করে এরকম একটা জঙ্গলে সদাশিব কী করে এতদিন কাটালেন? বহুদিন জিগ্যেস করেছে শুভ্র। মিটিমিটি হেসেছেন সদাশিব, কিন্তু প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেছেন। এই লোকটির মুখে আজ পর্যন্ত কারো নিন্দা শোনেনি শুভ্র। এটা কি নেহাতই ভালোমানুষী, নাকি সদাশিবজীর কূটবুদ্ধি! এই দ্বন্দ্ব

অনেকবার তার মনে জেগেছে। কিন্তু অনেক ভেবেও সদাশিবজীকে ধূর্ত সাজানো যায়নি। মনে মনে এতে বেশ খুশিই হয়েছে শুভ্র।

কোনোরকম বাদানুবাদে যেতে চান না ভদ্রলোক। কেউ যদি খুব নাছোড়বান্দা হয়, তবে কথা ঘুরিয়ে অদ্ভুত সব প্রসঙ্গ টেনে আনেন সাবলীল ঢং-এ। হয় গুনগুন করে টপ্পা গেয়ে ওঠেন কিংবা ভূতের গল্প বলেন। আর বলার মধ্যে আছে এমনই এক সারল্য—যাতে বিশ্বাস না হলেও শুনতে ইচ্ছে করে।

অন্যান্যদিনের মতো আজও শুভ্র জানতে চাইল, উনি এসব পার্টিতে কেন আসেন। সদাশিব তাঁর শুদ্ধ হিন্দিতে বললেন—"কেন, ভালোই লাগে তো!"

"কিন্তু আপনি তো বড়জোর একটা অ্যাপল জুস নেন।"

"তাতে কী?"

"তাতে কী মানে? আপনি ড্রিংক করেন না—হৈচৈ করেন না, এমনকী মেয়েদের দিকেও ভালো করে তাকান না। কী করে এনজয় করবেন তাহলে?"

শেষ কথাটায় সদাশিব লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন "আরে রাম রাম। ওরা সব আমার বাচ্চার মতো।"

শুভ্র হাসতে গিয়ে স্থির হয়ে যায়। সদাশিবজীর মুখের হাসিটা তাকে থামিয়ে দেয়। কীকরে এমন হাসেন ভদ্রলোক! চাঁদের আলোয় মানুষকে খুব সুন্দর দেখায়। সদাশিবজীর মুখে যেন সবসময়ই জ্যোৎস্নার সেই স্নিগ্ধ প্রলেপ রয়েছে!

সদাশিবজী হলের দিকে সোজা তাকিয়েছিলেন। প্রাচীন প্রফেটদের মতো। স্নিগ্ধ হাস্যমুখ কিন্তু নিরাসক্ত। যেন সব দেখে যাচ্ছেন—সব বুঝছেন, কিন্তু ভীষণ একটা গোপন কথা কাউকেই বলছেন না।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঝং করে একটা শব্দ হল। সবাই চমকে তাকিয়ে দেখল এক অদ্ভুত দৃশ্য।

বেটি এসেছে। এতক্ষণ কেউ খেয়াল করেনি যে আজকের পার্টিতে এতক্ষণ বেটি ছিল অনুপস্থিত। এখন সেএসেছে। তার দিকে তাকানো যায় না—সে এত লাল! লাল শাড়ি-লাল ব্লাউজ-লাল টিপ-লাল লিপ্‌স্টিক। তার অঢেল লম্বা চুল খোলা, এলোমেলো। বেটি দাঁড়িয়ে আছে ঘরের ঠিক মাঝখানে। তার সামনে একটা মদের বোতল টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বেটি মাতাল—আকণ্ঠ মদ গিলেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সে।

সবাই উঠে তার কাছে গেল। বেটি জড়ানো গলায় চেঁচাচ্ছিল, "আইল কিল্ ইয়ু! ডোণ্ট নো আয়্যম ক্যারিয়িং ইওর বেবি—ডোণ্ট ইয়্যু নো দীনেশ!"

দীনেশ স্তম্ভিত। স্তম্ভিত অন্যান্য সকলেই। সুমিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বেটি চিৎকার করে দীনেশকে গালাগাল দিচ্ছে। সে বলছে দীনেশ তাকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছিল। এই কথা দিয়ে সে বহুবার বেটির সঙ্গে শুয়েছে। তারপর বেটি কনসিভ করেছে শুনে ভয় পেয়ে সে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলেছে। দীনেশের মুখ শুকিয়ে গেছে, কীসেব বলতে চাইছে। বেটি শুনছে না। সে হঠাৎ দীনেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আঁচড়াতে লাগল। একনাগাড়ে চড় ঘুষি মেরে যেতে লাগল, তারপর হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল চিৎকার করে। তখনও সবাই চুপচাপ। হঠাৎ বেটি দীনেশকে ছেড়ে সরে এল। চারদিকে তাকাল। শুভ্রর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে এগিয়ে এল। শুভ্র বুঝতে পারছিল কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কিন্তু সে নড়ল না। সমস্ত শরীরকে শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। বেটি এসে তার হাত ধরল। তারপর প্রথমে খুব নিচু স্বরে—তারপর গলা তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে বলতে লাগল সুভ্রা তো সব জানে। তবে সে কেন ওদের বলছে না দীনেশ তার সঙ্গে কী করেছে?

শুভ্র দেখল, সবার চোখ তার দিকে। সবাই অবাক। অনেকে খুশি—এতদিনে তাকে একটা কেচ্ছার সঙ্গে জড়ানো গেছে। শুভ্র নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছিল বেটির এই ব্যবহারে। কিন্তু ঠিক করেছিল কোনো কথা বলবে না, অনেকক্ষণ সহ্য করবে।

কিন্তু বেটি উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল ক্রমেই। দু-হাত দিয়ে জোরে সে শুভ্রর কাঁধ চেপে ধরল। তার আঁচল খসে পড়েছিল। শুভ্র বেটির ছোট ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে উপচে পড়া স্তন, নাভিরেখা, তলপেটের কিছুটা দেখতে লাগল। কোনো কথা বলল না। বেটি রেগে যাচ্ছিল। অবশেষে শুভ্রর গায়ে প্রথম আঁচড়টা দিয়েই সে ভুল করল।

সপাটে তার দু-গালে দুটো চড় মারল শুভ্র। তারপর হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল বাথরুমের দিকে। শাওয়ার খুলে দিয়ে বেটিকে দাঁড় করিয়ে দিল নিচে। একটু বাদে অবসন্ন, সম্পূর্ণ ভেজা বেটিকে বাইরে বের করে সে সবাইকে বলল—"টেক হার টু আ ডকটার অ্যাণ্ড ইউল ফাইণ্ড হোয়াট শি জ বিন সেয়িং ইজ অল্ বুলশিট!' শুভ্র বেরিয়ে এসেছিল। বুঝতে পেরেছিল ও কোনো ভুল করেনি। দীনেশকে সে যতদূর জানে তাতে প্রোডাকশান ম্যানেজারের মেয়ের সঙ্গে এতদূর এগোবার সাহস ওর হবে না। দ্বিতীয়ত, বেটি এবং তার মতো

অন্যান্য মেয়েগুলোকেও তার চিনতে বাকি নেই। রেস্টোরেশান যুগের মেয়েদের মতো এদের মানসিকতা। কোনোরকমে একবার অন্তত লাইমলাইটে আসা চাই। আগামী একমাস এখানে মহিলাদের পরচর্চায় "বেটি" ছাড়া আর কোনো নামই জায়গা পাবে না। ছেলেরা বারবার তাকে দেখবে ফিরে ফিরে। বেটি নিশ্চয় এই চেয়েছিল।

বেটি কেন তাকে এর মধ্যে জড়াতে গেল তা বুঝতে পারেনি শুভ্র। তবে শুভ্র জানত এ-ছাড়া তার আর কিছু করার ছিল না। দীনেশের মতো আমতা-আমতা করলে বেটি তাকে ছিঁড়ে ফেলত।

কাল ফিরতে বেশি রাত হয়ে গিয়েছিল। ঋদ্ধি ঘুমিয়ে পড়েছিল। আজ ভোরে সে যখন বেরোয় তখনও ঋদ্ধি শুয়ে আছে। সকালে অফিসে এসে শুভ্র দেখল, মদন আসেনি। তারা দু-জন একই ঘরে বসে। সকালে সে যখনই কোনো বেয়ারাকে ডেকেছে বা ঘর থেকে বেরিয়েছে, তখনই লক্ষ করেছে দারুণ কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে অনেকে। তার মানে খবরটা ছড়িয়েছে। লাঞ্চ-এর জন্য কোয়ার্টাসে ফেরার পথেও এক অবস্থা। সবাই তাকে দেখছে। স্কুটার দাঁড় করিয়ে দিতে দিতে সে দেখল বেনার্জির গাড়ি ঢুকছে। বেনার্জি হাত তুলে "হ্যালো" বলে চলে গেল। কিন্তু শুভ্র লক্ষ করল যে বেনার্জি ওই অল্প সময়ের মধ্যেই ভালো করে মেপে নিল তাকে।

তাই এখন খিটখিটে মেজাজ তার। এতগুলো ঝামেলা একসঙ্গে সে আর সামলাতে পারছে না। ত্বিষার ব্যাপারটাও বোঝা গেল না। এতদিন হয়ে গেল এখনও তার পাত্তা নেই। শুভ্র এখন বারবার চাইছে ত্বিষা আসুক। নিজেদের ঝামেলা মিটমাট করে ওরা ফিরে যাক। এদিকটা সে সামলে নেবে।

স্কুটারটা কার পার্কিং-এ দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে শুভ্র ভাবল এবার তার লম্বা ছুটির প্রয়োজন। কোথাও বেড়াতে যেতে হবে।

নিজের ঘরে ঢুকে দেখল মদন এসে গেছে। মদন হাসল তাকে দেখে। "হায় হিরো"—হাত নাড়ল সে। "ফাক ইট!"—খিটখিটে মেজাজে নিজের চেয়ারে বসল শুভ্র।

"হোয়ট ফাক্ ইট"—মিচকে হাসি হেসে মদন বলল—"ইউভ বিকাম দ্য টক অব দ্য টাউন!"

মুখে অপরিসীম তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে শুভ্র গজগজ করতে লাগল "থ্যাঙ্ক ইওর লাকি স্টারস ইউ হ্যাভ্ন্ট বিন দেয়ার"।

মদন সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল শুভ্রর দিকে। একটা তুলে নিল শুভ্র। মদন লাইটার জ্বালাতে জ্বালাতে বলল "বাট দ্য প্রবলেম ইজ সল্‌ভ্‌ড।"

শুভ্র তাকিয়ে রইল। মদন বলে চলল যে আজ সকালে জগদীশ পাণ্ডে তার মেয়েকে নিয়ে যায় ডক্টর মালহোত্রার চেম্বারে। মালহোত্রা ভালো করে চেকআপ করে বেটিকে এবং জানায় যে সে মোটেও প্রেগন্যান্ট নয়। মদন তার বলা শেষ করল সেই ফিচেল হাসি হেসে: "বাট হি অলসো সেড-শি ইজন্ট আ ভার্জিন আইদার।"

শুভ্র আর জিগ্যেস করল না যে এতসব মদন জানল কী করে? মালহোত্রা মদনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গতকালের ব্যাপারটা এতক্ষণে নিশ্চয় তারও কানে গেছে। এখানে কোনো কিছুই চাপা থাকে না, তার ওপর এরকম একটা সেন্‌সেশানাল কেচ্ছা! মদনের সঙ্গে নিশ্চয় ফোনে কথাবার্তা হয়েছে তার।

"সো" ?—নিরাসক্ত মুখে জিগ্যেস করল শুভ্র।

"সো দি ওল্ড ফুল ইজ আউট টু অ্যাপোলোজাইস।"

এসব বদমাইশ মেয়েদের বাবা-মার এরকম ক্ষমা চাওয়ার ঘটনাও নতুন কিছু নয়। মাথা গরম হয়ে গেল শুভ্রর। বেচারা দীনেশ! নতুন বউয়ের সামনে কী সিনটাই না হল!

শুভ্র ঠিক করল, এবার থেকে এসব ব্যাপার নিয়ে আর একদম ভাববে না। এসব চিন্তা মাথায় এলেই সে বরফে-ঢাকা পাহাড়, বিরাট সমুদ্র—এরকম সব বড়-বড় জিনিসের কথা ভাববে।

হঠাৎ ফোন বাজল। ফোনটা তাদের দুটো ডেস্কের মাঝখানে একটা উঁচু টুলের ওপর রাখা। ফোনটা তুলল মদন। "হ্যালো—ও ইয়েস স্যার—হি ইজ হিয়ার—ইয়েস স্যার—জাস্ট আ মোমেন্ট প্লিজ" মাউথপিসে হাত দিয়ে সে হাসল—মাথা গরম করে দেওয়া হাসিটা—তারপর বলল, "জগদীশ পাণ্ডে—ইন দ্য মুড অব অ্যান অ্যাপোলজি"। শুভ্র রিসিভারটা ধরল। জগদীশ পাণ্ডের গলা সামান্য ভারী। সে শুভ্রকে একবার সময় পেলে তার ঘরে যেতে বলল। শুভ্র কিছুক্ষণের মধ্যেই যাবে বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল। মদন বলল—"হোয়াট ডিড হি সে?" উত্তর দিতে যাচ্ছিল শুভ্র। কিন্তু আবার ফোন বাজল। এবার এক্সটার্নাল সবুজ ফোনটা। সে তুলল। 'হ্যালো' ব'লেই ওপাশ থেকে এক মহিলা-কণ্ঠস্বর শুনল। এ-কণ্ঠস্বর একসময় সে খুবই চিনত।

ত্বিষা এসেছে প্রদীপকে সঙ্গে নিয়ে। স্টেশান থেকে ফোন করেছে। শুভ্র

চট করে দু একটা কথা বলে, মদনকে জানিয়ে বেরিয়ে এল। জিপের ব্যবস্থা করতে চলল সে।

৩

মেঘ। উত্তরের পাহাড়ের কোণ থেকে কালো ফিতের মতো পাতলা এক টুকরো মেঘ তিরিতিরি করে ভেসে এল। তারপর আর এক খণ্ড—তারপর আবার। একটু পরেই আশ্চর্য হয়ে গেল ঋদ্ধি যখন সে দেখল আকাশ মেঘে ঢাকা। এক ঝলক বাতাস বইল—ঠাণ্ডা। ঋদ্ধি দেখল—মেঘ রঙ বদলাচ্ছে। নিকষ কালো অন্ধকারে আলতো লালের ছোঁয়া লেগেছে। আবার বাতাস বইল—এবার জোরে। ঋদ্ধি বুঝল—এবার বৃষ্টি আসবেই। এসেও পড়ল বৃষ্টি। এমনিতেই কদিন ধরে বেশ ঠাণ্ডা এখানে। হঠাৎ ঝিরঝিরে বৃষ্টি এসে পড়ায় শিউরে উঠল ঋদ্ধি। ঘরে ঢুকে একটা চাদর জড়িয়ে নিল। বাইরে বৃষ্টির ফোঁটা ক্রমে বড় হচ্ছে। আর শব্দ বাড়ছে। ব্যালকনি থেকে চেয়ারটা টেনে আনল ঋদ্ধি। দরজা বন্ধ করে দিল। জানালার পর্দা টেনে দিল সে। শার্সির ওপরে বৃষ্টির ঝাপটা এসে পড়তে লাগল। চোখের সামনে থেকে একখণ্ড আকাশ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল—ঝাপসা হয়ে গেল জানালার কাঁচ।

ঘর অন্ধকার। ক টা বাজে এখন? টেবিলের ওপরে রাখা ছোট টাইমপিস বলল—তিনটে-তিনটে-। আর ঘর অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টি। আলো জ্বালাল ঋদ্ধি। একটা সিগারেট ধরাল। ঝকমকে আলোয় বিরক্তি ধরে গেল তার—ভীষণ তেতো লাগল সিগারেট। লাইট বন্ধ করে—সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে—ঋদ্ধি শুয়ে পড়ল। এই অন্ধকারে তার ভয়ংকর একা লাগল। গত তিন মাসের একাকিত্ব এর কাছে কিছু নয়। এখন ঋদ্ধি ক্লান্ত। চারদিকের তীব্র একাকিত্ব তাকে—ক্লান্ত ঋদ্ধিকে—নিষ্ঠুর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরল। বুকের কোথায় যেন একটা চিনচিনে ব্যথা—গলার কাছে কী-যেন একটা দলা পাকিয়ে রয়েছে—অন্ধকারে ডুবতে চাইল ঋদ্ধি। বালিশে প্রাণপণে মুখ গুঁজে পালাতে চাইল এক ভয় থেকে। কিন্তু অন্ধকার তো আর সমুদ্র নয়—এমনকী নদীও নয়। তাই ঋদ্ধি পালাতে পারল না। তাই সে কাঁদতে লাগল।

খুব অদ্ভুত তার এই কান্না! কিছু একটা ভাঙছে যেন কোথাও—আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গলা থেকে ভেসে আসছে তীব্র গোঙানোর শব্দ! তার চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে বিছানা—বালিশ—একসময় যেন এই ঘর ভাসতে লাগল। ঋদ্ধির মুখ বালিশে ঠেসে ধরা। তার ভেতর বছরের পর বছর জড়ো হচ্ছে—আর

ঋদ্ধি কাঁদছে। এবার রীতিমতো সশব্দে কাঁদছে ঋদ্ধি।—"কী করব? আমি কী করব? আমি আর কতদিন...কী করব আমি?"

বৃষ্টি বেশিক্ষণ রইল না। একটু পরেই জানালার গায়ে বৃষ্টির ছাঁট থেমে গেল। ঋদ্ধি উঠে বসল। বিছানায় বসে মাথা নিচু করে স্থির হয়ে রইল সে। ভীষণ ক্লান্ত—অবসন্ন ঋদ্ধি। সে আর কাঁদবে না।

সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি কী করব? কিসের অপেক্ষায় এখানে রয়েছি আমি? শুভ্রর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে এরই মধ্যে আমার বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল। এসবই তো আমি ভেবেছিলাম। তবে কি ত্বিষার অপেক্ষায় আছি? আমার সাব-কনশাসে কি ত্বিষার সঙ্গে আর একবার দেখা করার তীব্র ইচ্ছে ছিল? কিন্তু তারপর কী হবে?

বারান্দায় এল ঋদ্ধি। তার একটু হালকা লাগছে এখন। আবার আকাশ পরিষ্কার। অবশ্য এখানে শীতে আকাশ পরিষ্কার থাকা মানে মেঘ না-থাকা। মেঘ এখন নেই। আবার চেয়ারটা টেনে নিয়ে সে বসল। তাকে এই অবস্থায় বসে থাকতে দেখলে যে কেউ ভাববে সে কিছু ভাবছে। কিন্তু আসলে সে কিছুই ভাবে না। শূন্য মনে চারদিকে তাকায়। গত ক-দিনে সে বদলে গেছে আরো।

ঘাসগুলো ভিজে চকচক করছে। সেই উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ক্যাম্পাসে। বিকেল এরই মধ্যে ম্লান হয়ে গেছে। পার্বত্য সন্ধ্যা আসছে চারদিক ছেয়ে। আজ কেউ খেলতে বেরোয়নি। বেশিরভাগ কোয়ার্টার্স-এর দরজা-জানলা বন্ধ। বড় বিষণ্ণ লাগছে সব কিছু। এতক্ষণ যেন আকাশ আর ঋদ্ধিব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চারদিকের ওই বাড়িগুলো—দূরে ফ্যাক্টরির চিমনি—সবাই কাঁদছিল। ভেবে অদ্ভুত লাগল ঋদ্ধির যে সে একটু আগেই কাঁদছিল। শিথিল অবশ শরীরে স্থিরভাবে বসে সে সোজা তাকিয়েছিল—কোথাও না।

একটা গাড়ির শব্দ। খুব নির্জন বলে শোনা যায় এখানে। দূর দূরান্ত থেকে গাড়ি আসে—চলে যায় ফ্যাক্টরির দিকে। কখনও বা থামে এখানে—কখনও যায় স্টেশানের দিকে। কিন্তু এই গাড়িটা থামল। একটু এগিয়ে বাঁ-হাতেই মেন গেট। কিন্তু শব্দ আরো বাড়তে ঋদ্ধি বুঝতে পারল গাড়িটা ভেতরে আসছে। তার ভাবনা শেষ হবার আগেই শুভ্রদের অফিসের জিপটা এসে থামল ঠিক নিচে। এখান থেকেই শুভ্রর একপেশে মুখ দেখতে পেল সে। এত তাড়াতাড়ি শুভ্র ফিরে আসায় তার মাথায় চট করে ভাঙা-ভাঙা দুটো চিন্তা ঘুরে গেল। হঠাৎ এখন শুভ্র! তবে কি কেউ এসেছে? কে আসবে—ভাবতেই বুক স্থির ঋদ্ধির। প্রায়

তখনই গাড়ি থেকে নামল ত্বিষা, তারপরে প্রদীপ, একটু পরে স্টার্ট বন্ধ করে শুভ্র। শুভ্র ওপর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লে। বাকি দুজনও তাকাল। প্রদীপও হাত নাড়ল। কিন্তু ত্বিষা নয়। সে একদৃষ্টে চেয়েছিল। শুভ্র কিছু বলতেই সে প্রায় দৌড়ে ভেতরে ঢুকে এল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছিল ঋদ্ধি। সে কেমন নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, বারান্দা ছেড়ে ঘরেও ঢোকেনি। বিষণ্ণ এই বিকেলের প্রেক্ষাপটে তার দীর্ঘ সুঠাম শরীর এক অদ্ভুত ছবি আঁকল। কিন্তু সেই ছবির কোনো অর্থ হয় না।

দরজায় শব্দ হতে সে এগিয়ে গেল। ধীর পায়ে। দরজা খুলতেই দেখল ত্বিষাকে। প্রদীপ আর শুভ্র তখনও এসে পৌঁছয়নি।

তারা মুখোমুখি। মাঝখানে তিন মাস, আরো কিছু দিন। মাঝখানে তার আগের কয়েক বছর।

ত্বিষা তাকিয়েছিল। প্রথমে স্থির চোখে—তারপরে তার চোখ দুটো ঋদ্ধির মুখের আনাচে-কানাচে ঘুরতে লাগল। তারপর সারা শরীরে। অল্প কাঁপছিল ত্বিষা। সে তার বরকে দীর্ঘদিন পরে দেখছিল। তার দৃষ্টির আর কোনো অর্থ থাকলে তা ছড়িয়েছিল তাদের ভালবাসার দিনগুলোতে। মাঝখানের সাড়ে তিন মাস ছিল না কোথাও।

ঋদ্ধি অল্প হাসল। অপ্রতিভ ঠোঁট কোঁচকানো হাসি। ত্বিষা দেখল না। সে স্পষ্টতই ঝাঁপিয়ে পড়ল ঋদ্ধির ওপর।

এরকম বর্ণনা নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিনবত্ব থেকে যায়। আচম্বিতে এক সন্ধে হয়-হয় সময়ে বৃষ্টির ঠিক পরেই আবার যেন বাতাসের ঝাপটা এল। তখন ত্বিষা ঋদ্ধির দুই বাহুতে মুখ ঘষছে আর এক অদ্ভুত স্বরে বলছে—"কোথায় ছিলে তুমি? কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন? কোথায় ছিলে বলো—কোথায়?"

ঋদ্ধি দাঁড়িয়েছিল। সে স্বাভাবিক নিয়মে ত্বিষাকে জড়িয়ে ধরেনি। তাই যেন ত্বিষা আরো দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তার নখের আঁচড়ে ঋদ্ধির দুই বাহু রক্তাক্ত করে দিয়ে সেখানে মুখ ঘষতে লাগল ত্বিষা।

একসময় ঋদ্ধি ত্বিষার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, আর মাথার কাছে মুখ এনে খুব নিচুস্বরে বলতে লাগল—"কেঁদো না—শোনো—প্লিজ—আমি বলছি—ত্বিষা..."

বিচিত্র এক মানসিকতায় ত্বিষাকে তার গভীরভাবে আলিঙ্গন করতে সংকোচ

হচ্ছিল। অনভ্যাস—তাই হবে। এমনকী সে যে নামে ত্বিষাকে ডাকত সেটাও খুঁজে পেল না। ভাবল—"কী যেন নামটা—কী যেন?" তখন তার বুক ভিজে গেছে চোখের জলে। ত্বিষা থামছে না—হঠাৎ ঋদ্ধির মনে পড়ল নামটা—'তিষ্টি'। আর নামটা মনে পড়তেই কী জানি কেন তার ভেতরেও ধ্বস্ নামল একটা। ত্বিষার শরীরের চারপাশে তার হাতের বাঁধন আরো শক্ত হয়ে গেল।

সে যেন প্রথমে নিজেকেই বলতে লাগল "তিষ্টি—তিষ্টি"।

ত্বিষা চমকে তাকাল। ঋদ্ধিকে আঁকড়ে ধরে ত্বিষা তাকাল তার মুখের দিকে। "তিষ্টি"—আবার বলল ঋদ্ধি!

প্রদীপ আর শুভ্র স্বভাবতই আসেনি। বাইরে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় কুড়ি মিনিট। এই সময়ে তারা কোনো কথা বলেনি পরস্পরের সঙ্গে। শুধু মাঝে মাঝে চোখাচোখি হচ্ছিল। কখনও বা এরকম মুহূর্তে একজনের হাত চলে যাচ্ছিল অন্যের কাঁধের ওপর। বোঝা যাচ্ছিল ওদের বন্ধুত্ব কমেনি।

একসময় প্রদীপ বলল—চল্ এবার যাই। কিছু না বলে ঘাড় নাড়ল শুভ্র। তারপর, তারা সিঁড়ি ভেঙে ঘরের কাছে এল। ঋদ্ধি খাটের ওপরে বসেছিল। তার কোলে মুখ গুঁজে আধশোয়া ভঙ্গিতে ছিল ত্বিষা। ঋদ্ধি ত্বিষার মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। ত্বিষা নিস্পন্দ।

প্রদীপ-শুভ্র ঘরে ঢুকতে ঋদ্ধি তাকাল সোজা। মুখে কোনো একটা ভাব ফোটানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু বাকি দুজনের কাছে সেই মুখ মনে হল নির্বিকার। ত্বিষা মাথাও তুলল না।

শুভ্র স্মার্ট হবার চেষ্টা করে বলল—"কী জিনিস ভাই তোরা! দরজাটা ভেজিয়ে দিবি তো। আরে পুরো ক্যাম্পাস তোদের এপিসোড দেখতে জমা হয়ে যাবে—তখন বুঝবি। এনিওয়ে, আমি আর দীপ একটু আসছি তোদের এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করে। গেস্ট হাউসটা বুক করা যায় কিনা দেখি। এখন..."

ঘড়ি দেখল শুভ্র—"ঠিক পাঁচটা পঁচিশ। সাড়ে ছটার মধ্যে আসছি। এসে খেতে যাব।"

—ঋদ্ধি ঘাড় নাড়ল। প্রদীপের সঙ্গে চোখাচোখি হল তার। প্রদীপ আলতো হাসল। হাত নাড়ল। দুজনে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে দরজাটা টেনে দিয়ে গেল শুভ্র।

এবার ত্বিষা উঠে বসল। ঋদ্ধির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমায় কিছু বলবে না?"

ঋদ্ধি হাসল—"বলবার সময় দিয়েছ?" ঋদ্ধিকে হাসতে দেখে ত্বিষা আবার তাকে জড়িয়ে ধরল। তার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল "তুমি রোগা হয়ে গেছ।"

'তুমিও।'—ঋদ্ধি বলল। সে জানে সমস্যার কথা ভাবার সময় পরে আসবে। এখন তার বুকের ভেতরে কোথাও বরফ গলছে। সে ত্বিষার গালে আলতো করে মুখ ছোঁয়াল।

ত্বিষা হঠাৎই লক্ষ করল ঋদ্ধির হাতে আঁচড়ের দাগগুলো। বলল—"ইস! এগুলো আমি করেছি?"

ঋদ্ধি উত্তর দিল না। হাসিমুখে তাকিয়ে রইল। "বেশ করেছি! আবার করব!"—কিন্তু করল না ত্বিষা। সে ওই দাগগুলোর ওপর হাত বোলাতে লাগল। "খুব লেগেছে?"—জিগ্যেস করল সে।

"আগে হলে কী বলতাম?"—দু-হাতে ত্বিষার মুখটা ধরে তাকে দেখছিল ঋদ্ধি।

"ওঃ ঋদ্ধি, ঋদ্ধি, কোথায় ছিলে তুমি?"—আবার ভেঙে পড়ল ত্বিষা। তাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় টোকা দিতে দিতে ঋদ্ধি বলল "এখন নয় তিষ্টি সোনা। রাতে বলব। সব খুলে বলব রাতে। আমি তো ফিরে এসেছি।"

"না এসে যাবে কোথায়? আমি জানতাম তুমি ফিরে আসবে। তুমি অন্য কারো সঙ্গে—অন্য কোথাও—আমায় ছেড়ে থাকতে পারতে ঋদ্ধি?"

"না তিষ্টি—পারতাম না। তুমি তো জানোই আমি কেমন জেলাস আর অভিমানী ছিলাম। তুমি ছাড়া আর কে বুঝত আমাকে?"

ঋদ্ধি তার নিজের গভীরে সেই বরফ গলার শব্দ আর শুনতে পাচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে এবার তার ভেসে যাবার—ভাসানোর—সময় এসেছে। নিজেকে তাই সামলে নিল সে। ত্বিষাকে বলল—"এবার কি আমার সুইটি পাই একটু টয়লেটে যাবে? সে কি দেখবে তার মুখচোখের অবস্থাটা?" অনেকদিন পর আবার গভীরভাবে ত্বিষাকে চুমো খেল সে। ত্বিষার মুখের ভেতর যখন তার সন্ধানী জিভ ঘোরাফেরা করছিল তখন তার মনে হচ্ছিল, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। শরীর কত সহজেই সব মিটিয়ে দিতে পারে। তাই আসলে কিছুই মেটে না। ঋদ্ধি জানে, সব ঠিক নেই।

ঋদ্ধির এই হঠাৎ চুমোয় বিভ্রান্ত হয়ে গেল ত্বিষা। তার মনে পড়ছিল—

স্বভাবতই—আগেকার কথা। ঋদ্ধি চিরদিনই এরকম আচমকা পাগল করে দিত তাকে। ঋদ্ধি, তার ঋদ্ধি! ত্বিষার মধ্যে হাসি আর কান্নার এক তীব্র মিশ্র অনুভূতি হচ্ছিল। সে একটু পরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দুহাত দিয়ে ঋদ্ধির কাঁধগুলো চেপে ধরে মুখ ভ্যাঙাল। ঋদ্ধি আবার এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু ত্বিষা ততক্ষণে টয়লেটে ঢুকে গেছে।

ঘড়ি দেখল ঋদ্ধি। ছ-টা বাজতে দশ মিনিট বাকি, বেশ কিছু সময় আছে প্রদীপ আর শুভ্রর ফিরে আসতে। এখন তার খুব ঠাণ্ডা মাথায় কিছু চিন্তা করা উচিত। কিন্তু সে পারছে না। ভারী ক্লান্ত লাগছে তার। তাই পা ছড়িয়ে সে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

প্রদীপের সঙ্গে কোনো কথাই বলা হল না। ও একটু রোগা হয়েছে মনে হল। কিন্তু চেহারায় বিশেষ পরিবর্তন নেই। না-বেঁটে না-লম্বা না-রোগা না-মোটা গোছের সহজেই ভিড়ে হারিয়ে যাবার মতো চেহারা। চশমার মধ্যে থেকে এক-জোড়া বড় চোখ তাকিয়েছিল তার দিকে। কোনো কথা হয়নি। কিন্তু প্রদীপ বোঝে। কিছু কিছু ব্যাপার ও খুব বোঝে।

প্রদীপকে খুব ভালো লাগত তার। সে জানত তাদের দুজনের মধ্যে বিস্তর ফারাক। কিন্তু প্রদীপ বড় খোলামেলা ছিল। বড় সহজ। পড়াশুনোয় গভীরতা ছিল। আর ছিল এক বিষাদী রোমান্টিকতা। অবশ্য ঠিক বিষাদী রোমান্টিকতা জাতীয় কথাগুলো ভাবল না সে। কিন্তু যা ভাবল তা এই জাতীয় কিছুই হবে। তাদের মধ্যে অনেক ব্যাপারে মতপার্থক্য হত, কিন্তু বন্ধুত্ব কমেনি। নিজে কোনোদিন প্রদীপ হবে না জেনেও, প্রদীপকে খুব ভালো লাগত তার।

বাইরে এখন ঘন অন্ধকার। খোলা ব্যালকনি দিয়ে বৃষ্টিভেজা মাটির—বাতাসের গন্ধ আসছে। সারা শরীর জুড়ে আলস্য নেমে আসছে ঋদ্ধির। ত্বিষা টয়লেটে। সাড়ে তিন মাস পরে তারা আজ আবার মুখোমুখি হয়েছে। কাছে এসেছে। সামনে পড়ে আছে এক ভয়ঙ্কর রাত। ঋদ্ধি জানে না সে ঠিক কী বলবে? কী-ভাবে সব বোঝাবে ত্বিষাকে? কিন্তু তারও তো কিছু দেরি আছে।

বাথরুমে জলের শব্দ থেমে গেছে। একটু পরেই বেরোবে ত্বিষা। তার প্রেম-ভালবাসা-অভ্যাস। কেমন লাগছে তোমার ঋদ্ধি—সানফাবিচ? এটা কি আজকের ঘটনা, নাকি অনেক দিন আগের রিচি রোডের জীবনের এক টুকরো স্মৃতি, গোটা সময়টা? অপরিসীম ক্লান্তিতে চোখ বুজল ঋদ্ধি।

৪

"জীবনে এই দ্বিতীয়বার এত জোরে দৌড়োলাম বুঝলি? একবার দৌড়েছিলাম তুফানের পেছনে। তোর মনে আছে. এলাহাবাদে যাবার পথে—আমি প্ল্যাটফর্মে জল নিতে নেমেছিলাম. ট্রেন ছেড়ে দিল। কী সাংঘাতিক! আমার পরনে পাজামা আর হাফশার্ট। পাজামার নিচে আবার আণ্ডারওয়্যারও নেই। সবকিছু ট্রেনে। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে দৌড়োতে দেখলাম আমাদের কামরাটা পেরিয়ে গেল। এ-ও দেখলাম জানালার ধারে বসে তুই আর মনোজিৎ হাসছিস আর চেঁচাচ্ছিস, 'লড়ে যা—লড়ে যা স্-আলা! তুই পারবি!'—আমার খুব অসহায় লাগছিল। কিন্তু ওরই মধ্যে তোদের কাঁচা খিস্তি করছিলাম চেঁচিয়ে। তারপরে শেষের আগের কম্পার্টমেণ্টে উঠলাম। দেখা হল সেই মোগলসরাইয়ে। মনে আছে?—ও জানিস তো, মনোজিৎ সেল্স ট্যাক্সে কাজ করে, বীরভূমে আছে। মাঝখানে দু-দিন ছিলাম ওর ওখানে গিয়ে। দারুণ কাটল! শালা যা চেহারা করেছে না—পুরো খোদার খাসি।..."

প্রদীপ কথা বলছিল। শুভ্র সাগ্রহে মন দিয়ে তার কথা শুনছিল। তাদের কথা যেন আর শেষ হচ্ছিল না।

এখন তারা বসে আছে গেস্ট হাউসের একতলায়। ঋদ্ধি-ত্বিষার ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে তিনদিনের জন্য। চৌকিদার ঘর সাফাই করতে গেছে। একতলার ডাইনিং হলে বসে চা খেতে খেতে তার গল্প করছিল। প্রদীপ কথা শুরু করেছিল তাদের গত রাতে ট্রেনে আসার অভিজ্ঞতা নিয়ে। কিন্তু এতদিন না দেখা হবার ফলে দুই বন্ধুর বহু কথা জমেছিল। তাই সব আলোচনাই ঘুরে যাচ্ছিল। শুধু একটা ব্যাপারে দুজনেই নিশ্চিত। তা হল এই যে, ঋদ্ধি-ত্বিষার ব্যাপারটা খটো-মটো হলেও সব মিটে গেছে। এক্ষুনি ওদের পুনর্মিলনে বাধা দিয়ে নাক গলাতে চাইছিল না ওরা। পরে নিশ্চয়ই সব জানা যাবে। দু-জনে জমিয়ে গল্প করছিল।

"...তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, ত্বিষাকে তো উঠিয়ে দিয়েছি আগেই। গার্ডকে বলে কয়ে আমারও একটা সিট যোগাড় করেছি ফ্যাস্ট ক্লাসে—ওরই কম্পার্টমেণ্টে। সব ঠিক চলছিল। এরই মধ্যে আমার মনে পড়ল সিগারেট কেনা হয়নি। নামলাম, তারপর সেই এক গল্প। সিগারেট পেয়েছি—বুঝতে পারছি ট্রেন ছাড়ছে। কিন্তু স্টলের ছেলেটা খুচরো টাকা দিতে দেরি করছে। আমি যত চেঁচাই—ও ততই গুলিয়ে ফেলে। তারপর কোনোরকমে টাকা নিয়ে—দৌড় দৌড়। এবার অবশ্য ঠিক কম্পার্টমেণ্টেই উঠেছিলাম।"

ওরা হাসছিল। স্বল্পালোকিত এই ডাইনিং হলে ওদের মুখচোখ খুব মায়াবী আর স্নিগ্ধ মনে হচ্ছিল। স্মৃতিচারণের আনন্দে বারবার ওরা ভুলে যাচ্ছিল সেই মূল ঘটনাটা—যার জন্য ওদের এভাবে দেখা হল। আসলে ওরা ভাবতে চাইছিল না। না হলে ভাবার মতো কি কিছু ঘটেনি?—ঘটেছে। রাতে ট্রেনে আসতে আসতে ত্বিষা বারবার প্রদীপকে বলছিল, "ও নিশ্চয়ই এখনও আছে—বল্ প্রদীপ? আমরা যাওয়া পর্যন্ত শুভ্র নিশ্চয়ই ওকে আটকে রাখবে তাই না?" কখনও আবার ফিসফিসে স্বরে যেন নিজেকেই বলছে এমনভাবে বলছিল—"আমি বুঝতে পারছি না কীসের জন্যে? এমন কী হয়েছিল ঋদ্ধির—যা আমাকেও বলতে পারেনি!" ত্বিষার ওই অসহায় মুখ আর প্রশ্নের মধ্যে এক বিপর্যস্ত ভালবাসার ছাপ দেখেছিল প্রদীপ। তার খুব কষ্ট হয়েছিল। সে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আশ্বাস দিয়েছিল ত্বিষাকে। মন দিয়ে তার কথা শুনেছিল। তারপর প্রায় এক সময়ই তারা দুজনে ঘুমোতে গিয়েছিল। মাঝরাতে ট্রেনের দুলুনি যখন খুব বেশি, তখন একবার ঘুম ভেঙে যায় তার। সে দ্যাখে জানলার পাশে ত্বিষা বসে আছে। বাইরে দৃশ্যগুলো হেমন্তের জোৎস্নায় হারিয়ে যাচ্ছে, বাতাস বইছে হু-হু করে। এইসব—আর চলন্ত গাড়িতে এতগুলো ঘুমন্ত লোকের নিস্তব্ধতার মাঝখানে ত্বিষার বাইরের দিকে চেয়ে থাকা—দেখে প্রদীপের বুক মুচড়ে উঠেছিল অদ্ভুত এক আবেগে। ভেবেছিল শুভ্রকে সব গুছিয়ে বলবে।

কিন্তু এসব কিছুই বলা হল না। যে মুহূর্তে ঋদ্ধি-ত্বিষার দেখা হল, সে মুহূর্ত থেকেই যেন ওদের, বিশেষত প্রদীপের, উদ্বেগ এত হালকা হয়ে গেল যে সে ভেবে নিল সব মিটে গেছে। তাহলে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা কি আসলে বোঝা?—এমনকী প্রিয়জনের ক্ষেত্রেও?—ওরা এখনও কেউ ভাবেনি।

ওদের গল্প চলাকালীন এক সময় চৌকিদার এসে চাবি দিয়ে গেল।

শুভ্র বলল—"সব সাফ কর দিয়া?"

—"হাঁ সাব"—বলে চৌকিদার চলে যাচ্ছিল। শুভ্র তাকে ডেকে মনে করিয়ে দিল যে তার মেহমানরা ন-টা নাগাদ আসবে। আজ রাতে চৌকিদারকে ওদের জন্যে রাঁধতে হবে, আর সকালে সাব-মেমসাবকে ব্রেকফাস্ট দিতে হবে। চলে গেল চৌকিদার।

চা শেষ। শুভ্র ভাবছিল, আর এক কাপ করে চা হবে কি না? —কিন্তু হঠাৎ দেখল ছ-টা দশ বাজে। দুজনে উঠল তারা।

গেস্ট-হাউসটা ক্যাম্পাসের বাইরে। ফ্যাক্টরির কাছাকাছি। ইচ্ছে করেই

স্কুটার নিয়ে বেরোয়নি শুভ্র। গল্প করতে করতে হাঁটবে ভেবেছিল। এইটুকু রাস্তা হেঁটে মিনিট পনের-র বেশি লাগবে না।

বৃষ্টির ফলে ঠাণ্ডাটা একটু বেড়েছে। শুভ্র এতে কিছুটা অভ্যস্ত, কিন্তু প্রদীপের ঠাণ্ডা লাগছে বেশ। সে এই সময় শীত আশা করেনি। একটু জবুথবু হয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটছিল শুভ্রর পাশে পাশে। আকাশটা ফ্যাকাশে। দু-একটা তারা জ্বলছে। মেন রোডের আলোগুলো বেশি উজ্জ্বল নয়। ঝুপসি গাছে ঢাকা সটান কালো পিচের রাস্তাটা কেমন দীর্ঘ এক পাহাড়ি সাপের মতো পড়ে আছে। দূরে—বহুদূরে শব্দ। এই নিস্তব্ধতা ভেদ করে কোনো গাড়ি আসছে অনেক দূর থেকে। এ তারই শব্দ। কোয়ার্টারগুলো দূর থেকে তীব্র অন্ধকারের মধ্যে চৌকো উজ্জ্বল বাক্সের মতো দেখাচ্ছে।

প্রদীপ খুব তন্ময় হয়ে পথ চলছিল। তাদের দু জনের পাশাপাশি পা-পড়ার শব্দ হচ্ছিল। খুব মন দিয়ে সেই শব্দ শুনতে শুনতে প্রদীপ ভাবছিল—বহুদিন আগে দেওঘরে এমনই এক রাতে যে তার পাশে নিঃশব্দে হাঁটছিল, সে কে? অনিরুদ্ধ, কমল, নাকি শুভ্রই? মনে করতে না পারায় খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল সে।

"আচ্ছা, ওদের ব্যাপারটা কি খুব সিরিয়াস?"

জমাট অন্ধকার থেকে প্রশ্ন করল শুভ্র। প্রদীপ প্রথমে অর্থ বুঝতে পারেনি চিন্তার ঘোরে, একটু পরে বুঝল। বলল, "আসলে সমস্যাটা কী নিয়ে আমি তাই বুঝতে পারছি না।" কিছুক্ষণ আবার পা-পড়ার শব্দ।

প্রদীপই বলল—"ত্বিষা কিন্তু ঋদ্ধিকে সাংঘাতিক ভালবাসে। আমি উদ্বেল ভালবাসার কথা বলছি না। আসলে ত্বিষার মধ্যে যা-আছে, তা একটা খুব জটিল কিছু, খালি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিই তা বুঝতে পারে। আমি ঠিক জানি না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই।"

"ঋদ্ধিও ত্বিষাকে খুব ভালবাসে!"

"জানি-জানি!" মাথা ঝাঁকিয়ে বলল প্রদীপ, "সেরকমই তো জানতাম, কিন্তু তাহলে ঋদ্ধি কেন...আসলে ত্বিষার অনুভূতি আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। কাল রাতে—যখন ও জেগে বসেছিল ট্রেনের জানলার পাশে, তখন কীসের যেন একটা প্রতীক্ষা ছিল ওর মধ্যে—একটা বিশ্বাস—আমি ঠিক বলতে পারব না।"

"দ্য সেম ইনকিওরেবল রোমান্টিক"—মুচকি হাসল শুভ্র। আবার দু-জন হাঁটতে লাগল।

"কবে বিয়ে করছিস শুভ্র?"—প্রদীপ থেমে থেমে মৃদুস্বরে জিগ্যেস করল।

প্রশ্নের আকস্মিকতায় চমকে গেল শুভ্র। ঋদ্ধি-ত্বিষার প্রসঙ্গে হঠাৎ এই কথা। সে একটা যোগসূত্র বের করতে চাইল। কেন কথাটা বলল প্রদীপ? ওর! কি ধারণা শুভ্র ত্বিষাকে এখনও . ? কিন্তু প্রদীপ চুপ। একটু পরে বলল শুভ্র—"করব, কিছুদিন পরে।"

"এখানকার কোনো মেয়েকে?"

"মাই গড! তোকে আমি চিঠিতে জানাইনি এদের কথা?"

"জানিয়েছিলি। তবু।"

"না কিছুতেই না। এখানকার এই লাইফ আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো! আমি ভাবতেও পারি না চিরটাকাল আমাকে এখানে..." বলতে গিয়ে থামল শুভ্র। দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। তারপর খুব ক্লান্তস্বরে বলল, "কিংবা তাই করব হয়ত। এখানেই থেকে যাব সারা জীবন। এদেরই মধ্যে কাউকে বিয়ে করব। মাঝে মাঝে তোরা আসবি। কী জানি—ভাবি না এখন!"

বহুদিনের বন্ধুর এই অসহায়তা বুঝল প্রদীপ। সে তার হাত রাখল শুভ্রর কাঁধে। আর এই সামান্য স্পর্শেই দুজনের মনে পড়ে গেল আগের কথা—প্রথম যৌবনের কথা। প্রদীপ হঠাৎ আলতো গলায় গান ধরল—"দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না..."

গানের গলা খুব ভালো নয় প্রদীপের। কিন্তু এই সাংঘাতিক সন্ধ্যার অন্ধকারে—এক নিস্তব্ধ পাহাড়ি পথে এই গান একপুঞ্জ ভারি মেঘের মতো নেমে এল তাদের চারপাশে। গানের গভীরে ডুবে যেতে যেতে গলায় একটা দলা পাকিয়ে গেল শুভ্রর। প্রদীপ চলে যাবার পর সে যখন আবার একা এই পথে হাঁটবে তখন কেমন লাগবে তার? "স্বপন দেখি তারা যেন কার আশে / ওড়ে আমার ভাঙা খাঁচার চারপাশে"। কী নিষ্ঠুর গান! আগে এমন লাগেনি কখনও। চোখের জল দিয়ে লেখা যেন এর প্রতিটি শব্দ—প্রতিটি মূর্ছনা। কী সাংঘাতিক নিষ্ঠুর আর সত্যি এ-গানটা! প্রদীপের একটা হাত তার কাঁধ জড়িয়ে আছে। অত্যন্ত ব্যথার মধ্যেও এ আনন্দ পেল শুভ্র যে সে এখনো স্বাভাবিক, এখনও সম্পূর্ণ।

মিনিট পাঁচেক দেরি হল ওদের পৌঁছতে। ক্যাম্পাসে ঢুকেও এক বিষণ্ণতা বোধ ওদের ছেয়ে ছিল। ওরা ধীর পায়ে সিঁড়ি ভাঙল। দরজা খুলল ঋদ্ধি—অবিকল একই পোশাকে। ত্বিষা একটু সেজে নিয়েছে এরই মধ্যে, শুভ্র তাকে একবার দেখল। স্বভাবতই তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। আসলে ত্বিষার চেহারা,

কথাবার্তা, চলাফেরা সব কিছুতেই একটা সূক্ষ্ম ডিগনিটির ছোঁয়া রয়েছে। মেয়েদের এই রূপটা ভালবাসে শুভ্র। তাই কি সে ভালবাসত ত্বিষাকে? কিন্তু না। শুধু তাই নয়। শুভ্রা জানে, তার প্রেমিকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে ত্বিষা এরকম নয়। তখন তার অন্য রূপ। সেই রূপ মনে মনে কল্পনা করেছে শুভ্র—আগে। নিজেকে ত্বিষার প্রেমিকের জায়গায় বসিয়ে। কিন্তু এখন অনেক কিছু বদলে গেছে।

সে হাসল ত্বিষার দিকে তাকিয়ে। বলল—"অনেকক্ষণ সময় দিয়েছি তোদের, আর না। পেট জ্বলে যাচ্ছে খিদেয়।"

ত্বিষাও হাসল, বলল—"চল্। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবি?"

শুভ্র বলল—"একতলার ক্যান্টিনে।"

ঘর থেকে বেরোল তারা। নিচে নামবার পথেই ঋদ্ধি আর প্রদীপ একটু এগিয়ে গেল, শুভ্র আর ত্বিষা পেছনে। শুভ্র ত্বিষাকে বলছিল গেস্ট হাউসের ব্যাপারটা। এক ফাঁকে চাবিটাও দিয়ে দিল সে। ওদিকে প্রদীপ আর ঋদ্ধি দু-একটা কথা বলছিল। মাঝখানের সাড়ে তিনমাস একটা পাথর চাপা দিয়েছে যেন। তা-ও দু একটা কথা প্রদীপই বলে যাচ্ছিল। ঋদ্ধি শুধু হুঁ-হাঁ করছিল, এই পর্যন্ত। যদিও বোঝা যাচ্ছিল প্রদীপের সঙ্গে কথা বলতে বা ওর কথা শুনতে ঋদ্ধির খুব ভালো লাগছে।

ক্যান্টিনে খেতে খেতে শুভ্র দু-চারটে পুরনো রসিকতা করল। সবাই হাসল। এরকম হাসির মুহূর্তে ঋদ্ধি আর ত্বিষা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কিছু কি বদলেছে? —ভাবল দুজনেই। ত্বিষা ভাবল, "না, কিছুই না। সব একরকম আছে!" ঋদ্ধি ভাবল, "বদলে গেছে—কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না।"

রাস্তায় বেরুতে যাবে ওরা এমন সময় শুভ্র প্রদীপকে বলল—"চল্, ওদের ব্যাগগুলো নিয়ে আসি। যত তাড়াতাড়ি পারি বিদেয় করতে হবে ওদের।"

ঋদ্ধি আর ত্বিষা হুঁ...হাঁ করতে লাগল। ওদের ধমকে থামিয়ে দিল শুভ্র। ওরা ওপরে চলে গেল। ত্বিষা চট করে ভেবে নিল তার শাড়ি বা অন্তর্বাস কিছু বাইরে আছে কিনা। না—নেই। নিশ্চিন্ত হল' সে।

কোয়ার্টার্স থেকে বেরোনোর দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিল ওরা। সামনের ল্যাম্পপোস্টের মার্কারি আলো ঝলমলে করে তুলেছিল ওদের। ঋদ্ধি একটা

সিগারেট ধরাল। ত্বিষা ভাবল—"আমরা দুজন যেন কোথাও বেড়াতে এসেছি।" —সে ঋদ্ধির দিকে তাকিয়ে রইল।

দু-এক মিনিটের অস্বস্তিকর নীরবতাকে ঝেড়ে ফেলে ঋদ্ধি বলল—"তুমি কেমন আছ?"

এর কি কোনো উত্তর হয়? ত্বিষা চুপ করে রইল। বুঝল ঋদ্ধি। তাই সে প্রসঙ্গ বদলে কলকাতার কথা জিগ্যেস করল। জিগ্যেস করল ত্বিষার নতুন বাড়ির কথা, তার বাবা-মার কথা। উত্তর দিতে দিতে ঋদ্ধিকে একদৃষ্টে দেখছিল ত্বিষা। এই প্রথম তার মনে গভীর চিন্তা এল। তাহলে কি সত্যিই কিছু হয়েছে? সাংঘাতিক কিছু? এমন কিছু যা আজ রাতের মধ্যেই মিটে যাবে না?

দূর থেকে শিস দিতে দিতে এল শুভ্র। তার হাতে একটা অ্যারিস্টোক্র্যাট-এর বাক্স, ঋদ্ধির জিনিসপত্র প্রদীপের হাতে। সমস্ত বিরক্তি ভুলে প্রাণপণে স্বাভাবিক, আমুদে হবার চেষ্টা করছিল শুভ্র। প্রদীপের বিশেষ ভাবান্তর নেই। তার ভাবটা এমন যেন, সবই ঠিকঠাক চলছে, সবই স্বাভাবিক।

গেস্ট হাউসে যাবার পথটা আরো অন্ধকার হয়েছে এতক্ষণে। বেশিরভাগ কোয়ার্টার্সে অল্প আলো জ্বলছে। শুভ্র আন্দাজ করল এখন ক্লাবে ভিড় জমে উঠেছে। গা শিউরে উঠল তার—রাগে, বিরক্তিতে: প্রদীপ আবার গান ধরেছিল, "এ পথে যখনি যাবে আঁধারে চিনিতে পাবে...।" একটু পেছিয়ে পড়েছিল ঋদ্ধি আর ত্বিষা। ঋদ্ধির হাত ধরল ত্বিষা। জোরে—শক্ত করে। ঋদ্ধি আলতো করে ত্বিষার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

কিন্তু এখন ঋদ্ধি আসলে খুব চিন্তায় আছে। বুঝতে পারছে যে ক্লাইম্যাক্সের সময় কাছেই। কিন্তু সে কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না। কী করবে সে? কী ভাবে ঘটবে সেই ব্যাপারটা? সব কিছু বলার—বোঝানোর ব্যাপারটা?

ঋদ্ধির হাত শক্ত করে ধরে ত্বিষা ভাবছিল আর ভাবছিল। সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছিল ধীরে ধীরে জমে ওঠা আশঙ্কাটাকে। ভাবতে চাইছিল তারা দুজন আলাদা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রদীপ গান গাইছিল..."ভয় পাছে শেষরাতে ঘুম আসে আঁখিপাতে", আর শুভ্র এতক্ষণে এই প্রথম ভাবছিল আগামী কাল অফিসে কী ঘটবে—সেই কথা। প্রোডাকশান ম্যানেজারের ঘরে যেতে হবে সকাল-সকাল। অ্যাপলজি প্রত্যাখ্যানের

জন্যে সে বুড়ো হয়ত রেগে রয়েছে। ব্যাপারটা বোঝাতে হবে। কী কী করতে হবে ভাবছিল সে।

গেস্ট হাউসের ঠিক সামনেই একটা পুকুর। সেখানে যেতে বেশ শীত লাগল সবার। ত্বিষা ঋদ্ধির গায়ের কাছে ঘেঁষে এল। প্রদীপ জবুথবু হয়ে পকেটে হাত ঢোকাল। গান থেমেছে তার।

চৌকিদারকে ডাকল শুভ্র। রান্না কতক্ষণে হবে জিগ্যেস করল। সে বলল, "জাদা সে জাদা এক ঘণ্টা।"

"তোরা কটায় খাবি?"—জিগ্যেস করল শুভ্র, ঋদ্ধি আর ত্বিষাকে।

"সাড়ে নটার আগে কোনো চান্স নেই"—ত্বিষা ঋদ্ধির দিকে তাকিয়ে বলল। ঋদ্ধি ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ-বোধক।

"আটটা বাজে এখন"—ঘড়ি দেখল শুভ্র। তারপর চৌকিদারকে বলল "সাড়ে নও বাজে খানা লাগানা।" —চৌকিদার "ঠিক হ্যায় সাব" বলে চলে যাচ্ছিল। শুভ্র ডেকে জিগ্যেস করল—"অওর কৌন কৌন হ্যায় অব ইঁহা।"

"ব্যস এক শ্যামসুন্দরজি হ্যায়, ঔর কোই নহি"—চৌকিদার বলল, চলে গেল।

শ্যামসুন্দর মালহোত্রা। ইলেকট্রিকাল সেকশানের রামপ্রকাশ মালহোত্রার বাবা। বাতিকগ্রস্ত বুড়ো। বাড়ি চণ্ডীগড়ে। প্রতি বছর কিছুদিন এসে ছেলের কাছে থাকে। রামপ্রকাশ খুব ভালো ছেলে, কিন্তু ভীষণ মিচকে। বাবা যতদিন থাকে ততদিন রোজ সন্ধেয় এসে বুড়োর বকবকানি শোনে। ভোরে বাবার সঙ্গে মর্নিং ওয়কে বেরোয়, বাবা বিয়ের কথা বললেই ভীষণ মিষ্টি হেসে বলে—"উওতো করনাহি পড়েগা।" আর বুড়ো চলে গেলেই আনন্দে আটখানা হয়ে বলে—"স্-আলা বুঢ্ঢা চলা গ্যয়া।"

শুভ্র বলল, "যাক—একঘণ্টা এখন তোদের জ্বালাব। চল্, ঘরে চল্।"

সামনেই সিঁড়ি। কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে ওপরে ওঠে ওরা। করিডোর দিয়ে একটু এগিয়ে বাঁ-হাতি ঘর। করিডোরে একটা টিউব মিটমিটে জ্বলছে। শুভ্রর পেছনে হাঁটতে হাঁটতে ওরা যে ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল তার গায়ে লেখা "৪"। চারটেই ঘর আছে দোতলায়। তিনতলায় আর দুটো ঘর।

দরজা খুলল শুভ্র। কিন্তু ভেতরে ঢোকার আগে বলল—"তোদের একটা সারপ্রাইজ দেব। চোখ খুলিস না—প্লিজ। দরজা আমি খোলা রাখছি। যেই বলবো 'রেডি' অমনি ঘরে ঢুকে চোখ খুলবি—রাইট?" এই খেলায় সবাই রাজি হল। এবং ছেলেমানুষের মতো সত্যিই চোখ বন্ধ করে রইল।

"খুট" করে একটা শব্দ হল। সবাই বুঝল শুভ্র লাইট জ্বালাচ্ছে, এবার আর একটা শব্দ—জানালা খোলার হবে নিশ্চয়—ওরা ভাবল। শুভ্র "রেডি" বলতেই ওরা ঘরে ঢুকে চোখ খুলল। প্রত্যেকেরই মনে হল যেন ঠিক জলের ওপর ভাসছে। ঘরের ল্যাম্প থেকে নরম হলদেটে আলো ছড়াচ্ছিল। জানলা দিয়ে তাকালেই বিরাট পুকুরটা। তার জলে চিকমিক করছে তারা। ওপারে জঙ্গল। ওরা সবাই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

"আসলে এটা হচ্ছে গেস্ট হাউসটার একটা এক্সটেনডেড অংশ। এখানকার বেস্ট রুম।"—তার সারপ্রাইজটা বেশ ভালো হয়েছে, বুঝতে পেরে খুশি হয়ে বলল শুভ্র, "ব্যালকনিতে আয়—দারুণ লাগবে।" বলে একটু এগিয়ে সে ভেতরের দরজাটা খুলল। সবাই ব্যালকনিতে এল। নিচে তাকালেই জল—ওধারেও জল। সেই জলে তারার কাঁপন—বাতাসে একটা কন্‌কনে ঠাণ্ডা ভাব। গা শিউরে উঠল ওদের।

এ-সময় সবাই চুপ। শুভ্র শরীরের কোন, একটা অদৃশ্য জায়গা থেকে পেটমোটা রামের বোতলটা বের করে আনল। ছিপি খুলে এক চুমুক দিয়ে সেটা বাড়িয়ে দিল প্রদীপের দিকে, প্রদীপ অনেকটা খেল। এগিয়ে দিল ঋদ্ধিকে। ঋদ্ধি সাগ্রহে বোতলটা হাতে নিল। একটা বড় চুমুক দিল। সে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল শুভ্রকে, এমন সময়ে ত্বিষা বলল—"আমিও খাবো"। ত্বিষার হাতে বোতলটা এগিয়ে দিল ঋদ্ধি। ত্বিষার মনে পড়ল তার মদ খাওয়া ঋদ্ধির পছন্দ ছিল না। আপত্তি না করলেও ত্বিষা বুঝতে পারত। সে খেত না। এমনিতেও তার খেতে বিশেষ ভালো লাগত না। বিশ্রী তেতো তরলটা মুখে ঢুকতেই মুখ কুঁচকে গেল ত্বিষার। তবুও সে অনেকটা খেল। এগিয়ে দিল শুভ্রর দিকে।

এরপর কিছুক্ষণ ওই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েই গল্প চলতে লাগল ওদের। আরো দু-এক চুমুক মদ খেল সবাই। ত্বিষা আর নয়। ত্বিষা দেখতে চেয়েছিল সে বোতল হাতে নিলে ঋদ্ধির চোখে সেই আপাত উদাসীনতা জাগে কিনা। কিন্তু জাগেনি। গল্প নেহাত মন্দ হল না। বেশির ভাগই ইউনিভার্সিটির সময়ের গল্প। এছাড়া শুভ্র এখানকার অদ্ভুত লোকদের নিয়ে মজার মজার কিছু কথা বলল। হঠাৎ দম্‌কা একটা বাতাস বইল। তীব্র ঠাণ্ডা সে বাতাস! এরই মধ্যে প্রদীপ হঠাৎ ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ করল।

"দেখেছিস, আকাশে একটাও তারা নেই!" সবাই তাকাল, কেউ আকাশে—কেউ বা পুকুরে। সত্যিই সব তারা ঢেকে গেছে। আবার নিকষ কালো অন্ধকার। আর বাতাস। বৃষ্টি শুরু হবে।

"ন-টা বাজে দীপ, চল এবার আমরা কাটি। বৃষ্টি নামলে মুশকিল হবে কিন্তু। এমনিতেই তো কাটা পাঁঠার মতো কাঁপছিস !"

সামান্য হলেও নিট মদ খেয়ে প্রদীপের তলতলে নেশা হয়েছিল। একটা ভ্যাবলা গোছের হাসি হেসে সে বলল—"চল্ যাই !"

এরপর দু-একটা ছোটোখাটো কথা বলে ওরা বেরিয়ে এল। শুভ্র নিচ থেকে চেঁচিয়ে জানাল যে সে কাল দুপুর থেকে পরশু গোটা দিন ছুটি নেবে। নদীর ধারে সবাই মিলে পিকনিকে যাওয়া হবে। হাত নেড়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা রাস্তায়। ওপর থেকে ঋদ্ধি-ত্বিষাও হাত নাড়ল।

একটু হেঁটেছে কি হাঁটেনি, হঠাৎ আবার বৃষ্টি নামল। একেবারে ঝরঝর করে। সঙ্গে বাতাস। কোনোরকমে টালমাটাল খেতে খেতে ওরা যখন কোয়ার্টার্সে ফিরল তখন একেবারে চুপচুপে হয়ে গেছে। এবার আর প্রদীপ কোনো গান গায়নি। সে হি-হি করে কাঁপছিল। দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করেছে শুভ্র। কিন্তু উত্তরে প্রদীপের দাঁতের খট্‌খট্ শুনে সে আলাপ থামিয়ে দিয়েছে।

ক্যান্টিনের পাশ দিয়ে যাবার সময় ভেতর থেকে আনোয়ার ডাকল। "আরে—সুনো সুভ্‌রা।"

প্রদীপকে এগোতে বলে শুভ্র বলল—"বোলো।"

"তুম্‌হারা উও দোস্ত চলা গ্যয়া ক্যা ?"

"নেহি, উও আজ গেস্ট হাউসমে রহেগা। উসকি বিবি আজহি কলকাত্তাসে আ চকি।"

"ও-আই সি—" বলে আবার খেতে শুরু করল আনোয়ার। শুভ্র বলল—"ক্যারি অন—আইল জয়েন ইউ রাইট নাও।"

ঘরের দিকে যেতে যেতে শুভ্র বুঝল যে ঋদ্ধি শুধু এখানকার মহিলাদেরই নয়, পুরুষদেরও আলোচনার এক মুখ্য এবং রসালো বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫

ও যেন এক ঢেউ। রাতের সমুদ্রের নীলচে কালো ঢেউ। ফুঁসছে-ফুলছে। সে পেরোবার চেষ্টা করছে ওটাকে। কিন্তু একই সঙ্গে বুঝতে পারছে যে, তা সম্ভব নয়। ওই ভয়ঙ্কর ঢেউ তাকে গ্রাস করবে। তার পরের কথা সে জানে না। শুধু এক বিকট ভয়ে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যায় বিপজ্জনক-ভাবে। সে জানে, পিছনে কেউ নেই। দীর্ঘ-অন্ধকার বেলাভূমি অনেকদূর পর্যন্ত কালো হয়ে আছে। ওদিকে সে ঢেউটাকে ছাড়িয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু কত

বড় ওটা? কী সাংঘাতিক গুর ওই পাহাড়ের মতো আকৃতি! প্রবল আতঙ্কে হারিয়ে যেতে যেতে সে ভাবল, আর সময় নেই। তার হাত দুটো দুর্বল—বুক ফেটে যেতে চাইছে—মাথাভর্তি অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে ত্বিষার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"কী হল?" হাঁফাতে হাঁফাতে চারদিক দেখল ঋদ্ধি। নীল রঙের আলোয় তার শরীরের আড়ালে ত্বিষা। সে একটু সরে এল—দেখল ত্বিষার মুখ ঘামে ভিজে গেছে, চোখের কোণে এখনও ঘোলাটে ভাব। আস্তে আস্তে ত্বিষার গলা, স্তন এবং একটু উঁচু হয়ে ওঠা স্তনবৃন্ত, পেট, তলপেট, আসঙ্গলিপ্সায় আকুল দুই ছড়ানো পা এবং তার মধ্যে উদগ্র সেই অন্ধকার ঢেউটা দেখতে পেল সে। চোখ বন্ধ করল। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমেই স্বাভাবিক হয়ে এল। একটু জড়ানো গলায় ত্বিষা আবার বলল—"কী হল? প্লিজ—"

বালিশে মুখ গুঁজল ঋদ্ধি। তার উলঙ্গ সুঠাম শরীর এই অল্প আলোয় এক অদ্ভুত সৌন্দর্য পেল। ত্বিষা তার দিকে পাশ ফিরল। ঋদ্ধিকে দেখে আবার উত্তেজিত হল সে। কিন্তু কিছু বলল না। ধীরে ধীরে উঠল। খাটের তলা থেকে প্যান্টি আর নাইটি কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল লাগোয়া বাথরুমে।

একইভাবে শুয়ে রইল ঋদ্ধি। তাকে দেখলে এখন ইমপ্রেশনিস্টদের আঁকা এক ছবির কথা মনে হতে পারে। ছবিটির নাম হতে পারে—দেবতার মৃত্যু। ম্লান নীলচে আলোয় খাটের ওপর তার উলঙ্গ, প্রায় নিস্পন্দ শরীর ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

কেউ এখন ঘড়ি দেখলে বুঝবে যে মাত্র সোয়া-দশটা বাজে। প্রদীপ-শুভ্র চলে যাবার পর তারা ঘরে এসে বসেছিল কিছুক্ষণ। ত্বিষা চিন্তিত—ঋদ্ধি আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় ব্যাকুল। তাই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করেই বসেছিল তারা। একটু পরে ত্বিষাই বলল—"তুমি এখনও বলবে না?"

গলার কাছে একটা স্তূপ জমা হল ঋদ্ধির। আবেগের এক তোড়ে তার ইচ্ছে করল সব বলে ফেলতে। মনে হল, ত্বিষাই তো তার সবচেয়ে কাছের মানুষ। গত কয়েকবছর ধরে তার একমাত্র সঙ্গী। সব বললে ত্বিষা নিশ্চয়ই বুঝবে। কিন্তু গলার কাছে ওই স্তূপটা ফেটে পড়তে চাইছে যে! তবে কি আবার ছেলেমানুষের মতো কাঁদবে ঋদ্ধি? না—কিছুতেই না! নিজেকে সামলে নিল সে। তারপর বলল—"বলব—আর একটু সময় দাও।"

বাইরে এখন তুমুল বৃষ্টি।

সাড়ে নটার কিছু আগেই ওরা খেতে গিয়েছিল নিচে। ডাইনিং রুমে বিশেষ কথা হয়নি। দুজনেই খুব অল্প খেল। খেতে খেতে দূরে বৃষ্টিতে ভিজে-যাওয়া গাছ, প্রান্তর দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল ঋদ্ধি। কোনোরকমে খাওয়া শেষ করে ওপরে এল তারা। ঘরে ঢুকে বাথরুমে গেল ঋদ্ধি। দাঁত মেজে—হাত-পা ধুয়ে ঘরে এল। ত্বিষা টিউব নিভিয়ে দিয়ে নীল আলোটা জ্বেলেছিল। খাটে স্থির হয়ে শুয়েছিল সে! পরনে ছিল খালি আকাশী রঙের প্যান্টি। নাইটি পাশে রাখা। ঋদ্ধি এক মুহূর্ত তাকে দেখল। ত্বিষা অদ্ভুত এক হাসি হাসল। এরকম হাসি আগে তাকে কখনও হাসতে দেখেছে কিনা—জানে না ঋদ্ধি। সে বিছানায় ত্বিষার পাশে এসে বসতেই ত্বিষা দু-হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। ঋদ্ধি বুঝল যে ত্বিষা চাইছে। একটা অল্প আশঙ্কা তিরতির করে তার মাথা থেকে বুকে গড়িয়ে পড়ল। ঋদ্ধি ভাবল—না, সব ভুল! আসলে সবই স্বাভাবিক। সে ঝুঁকে পড়ে ত্বিষার ঠোঁটে চুমো খেল।

অল্প সময়ের মধ্যেই সে বুঝতে পারল—ত্বিষা ক্ষুধার্ত। তার তীব্র উত্তেজনাময় ছটফটানি—শীৎকার আর নখের আঁচড় ঋদ্ধিকেও জাগিয়ে তুলল। শরীর কিছু বোঝে না, খালি খাবার চায়। কিছুক্ষণ বেড়ালের হিংস্রতায় তারা পরস্পরকে চাইল। এরপর সেই চরম মুহূর্ত, যখন ত্বিষার দুই পা প্রসারিত, চোখ বন্ধ আর শীৎকার প্রবলতর তখনই সেই ব্যাপারটা ঘটল।

ওই অন্ধ মারাত্মক কালো ঢেউটা আসছে এটা বুঝল ঋদ্ধি। বাইরে তখন তীব্র বৃষ্টি। ভয়ে—অসহায়তায়—তলিয়ে যেতে যেতে সেই বৃষ্টির কাছে, বাতাসের কাছে এবং ঈশ্বরের কাছে নিঃশব্দ চিৎকার করে ভিক্ষা চাইল ঋদ্ধি—না-না!—অন্তত একবার শুধু—একবারের মতো—

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো ঢেউটা এসে গেল। ওটাকে পেরোতে পারল না ঋদ্ধি—ঢেউটা তাকে গ্রাস করল। তার ঝুঁকে পড়া শরীরে শিথিলতা এল। ত্বিষা জিগ্যেস করল—"কী হল?"

এখন ঋদ্ধি বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। নিঃশব্দ—নিস্পন্দ। বৃষ্টির রাতে অলীক এক ছবির মতো!

কে জানে কতক্ষণ পরে যেন ত্বিষা এল। টিউবটা জ্বালাল। বিছানায় ঋদ্ধির পাশে বসে তার পিঠে হাত রাখল। ঋদ্ধি নড়ল না।

ত্বিষা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বলল—"ঋদ্ধি, আমার মনে হয় এবার তোমার সবকিছু খুলে বলা উচিত।"

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। ঋদ্ধি ধীরে ধীরে উঠে বসল। গায়ের চাদর টেনে নিল বুক পর্যন্ত। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা নিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—"বলব, এখনই বলব।"

এখন বৃষ্টি কমে এসেছে—বেড়েছে হাওয়া। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। তবু কোথা থেকে শোঁ শোঁ শব্দে ভেসে এল হাওয়া। ঘরে দমকা বাতাস ছুটে এল। ত্বিষা উঠে দেখার চেষ্টা করল বাতাস কোন্‌দিক থেকে ঘরে ঢুকছে। কিছু মনে পড়ায় সে বাথরুমে গেল। হ্যাঁ—জানালাটা খোলা ছিল। সেটা বন্ধ করে ফিরে আসতে আসতে ত্বিষা ভাবছিল না কিছুই।

ঋদ্ধি চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে। ত্বিষা পাশে বসল। ঋদ্ধি বলল—একেবারে হঠাৎই—"তেইশে জুলাইয়ের কথা কিছু মনে আছে?"

ত্বিষা একটু ভাবল। বলল—"না।" "তারপর প্রশ্নটা জুড়ে দিল—"কেন?"

"আমি তেইশে জুলাই রাত সাড়ে এগারোটায় ঠিক করেছিলাম যে চলে যাব। তোমায় ছেড়ে—সবকিছু ছেড়ে। এমনকী একবার আমি...ওয়ান্‌স আই থট অব কমিটিং সুইসাইড।"

"কী বলছ তুমি! কেন—কী হয়েছিল সেদিন রাতে?"

—দিশেহারা হয়ে ত্বিষা জিগ্যেস করল।

"সেদিন রাতে উই মেড লাভ টিল ইলেভেন থার্টি।"

ঋদ্ধি হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। গলা ঝেড়ে বলল—"না—আর ড্রামাটাইজ করব না! ত্বিষা, জুলাইয়ের গোড়া থেকেই আমার খালি মনে হচ্ছিল—আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি। যখন আমরা ব্যাপারটা করতাম তখন নয়, তার পরে। আমার খুব ক্লান্ত লাগত। আই সেন্সড সামথিং ইভ্‌ল! এভাবে চলছিল। একদিন সকালে—মনে আছে—তুমি জিগ্যেস করলে, আমার কী হয়েছে? আমি বললাম, জ্বর মনে হচ্ছে। তুমি অফিস যেতে দিলে না আমাকে, দ্যাট ওয়াজ ফিফ্‌টিন্থ জুলাই। সেদিন তুমি চলে যাবার পর আমি প্রথমে গেলাম লর্ড সিন্‌হা রোডে ডক্টর ডি. সুব্‌বার কাছে। চেনাশোনা ডক্টরের কাছে ইচ্ছে করেই যাইনি। আই ওয়জ টেরেব্‌লি অ্যাশেম্‌ড অব দ্য হোল থিং। আরো খারাপ লাগছিল—কারণ তোমায় কিছুতেই খুলে বলতে পারছিলাম না সব। ডক্টর সুব্‌বা আমার সব কথা শুনলেন। একটা থরো চেক-আপ হল সেদিন। হি অলসো এনকারেজড মি ইন ভিজিটিং আ সাইকিয়াট্রিস্ট। আমি গেলাম ডক্টর চৌধুরীর কাছে। প্রায় দু-ঘণ্টা আমার সঙ্গে কথা বলে

আমায় জানালেন যে মাইন ওয়জণ্ট আ প্রবলেম অব দ্য মাইণ্ড। তারপরেও আমি অফিস যাবার নাম করে প্রায় দু-তিন দিন ওঁর চেম্বারে গিয়েছিলাম। লাস্ট টাইম আই ওয়েণ্ট দেঅ ওয়জ অন নাইনটিন্থ জুলাই। সেদিন আমি ডক্টর সুব্বার সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন চৌধুরী ডিক্লেয়ার্ড মাই ডিজিজ টু বি পিঅরলি ফিজিকাল। ডক্টর সুব্বা কিন্তু আমার মধ্যে অ্যাবনর্মাল কিছু পাননি। তবু আমি আবার ফিরলাম তার কাছে।

মাঝখানের দিনগুলো ভাবো। এমনকী তোমার চোখেও কিছু ধরা পড়েনি। আমি যখন অফিস-টাইম পেরিয়ে গেলেও যাবার তাড়া দেখাতাম না, তখন তুমি কিছু ভাবতে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ইউ কুড নেভার ইম্‌ম্যাজিন। জোর করে আমায় অফিসে পাঠাতে, কিন্তু আসলে আমি যেতাম না। সারাদিন ঘুরে বেড়াতাম ডাক্তারদের চেম্বারে। আই লেফ্‌ট ডক্টর সুব্বা ইন গ্রেট ডেসপেয়ার। তারপর একদিন ডক্টর নিখিল চ্যাটার্জি আমায় জানালেন যে আমি *দিনের পর দিন* ..আলোটা নিভিয়ে দাও ত্বিষা—আমার খুব লজ্জা করছে—বিলিভ মি! পুট আউট দ্য লাইট অ্যাণ্ড পুট আউট দ্য"—কথা শেষ না করেই ঋদ্ধি বেশ জোরে হেসে উঠল।

ত্বিষা আলোটা নিভিয়ে দিল। এখন আবার ঘরে সেই নীল ডিম্ আলো জ্বলছে। ঋদ্ধি বলল—"দুদিন বহুক্ষণ ধরে আমায় পরীক্ষা করে, আমার সঙ্গে কথা বলে ডক্টর চ্যাটার্জি আমায় বললেন...আই ওয়জ বিকামিং ইমপোটেণ্ট ডে বাই ডে।"

বাইরের কোনো শব্দ এখন আর ত্বিষার কানে আসছে না। এখন প্রায়ান্ধকার ঘরে শুধুই ঋদ্ধির ফিসফিসে কণ্ঠস্বর। তার গলা কাঁপছে না।

ত্বিষা চুপ করে আছে। তার ভেতরটাও নিস্পন্দ। যেন কোনো গাছের একটাও পাতা কাঁপছে না কোথাও। শুধুই বাতাস বইছে। সে ভাবছিল না। কী ভাববে? এখন তো সে শুনছে।

ঋদ্ধি এখন তাকাতে পারছে ত্বিষার দিকে—"আমি সব রকম চেষ্টা করেছি ত্বিষা। কিন্তু কিছুই হবার নয়। ব্যানার্জির পরে অনেকেই—অন্যান্য অনেক ডক্টর আমায় বলেছে যে এরকম হয়। এর কী একটা নামও আছে। আমি ভুলে গেছি ত্বিষা। আমি অনেক কিছুই ভুলে গেছি। আজ তুমি আসার আগে পর্যন্ত আমি আরো অনেক কিছু ভুলে ছিলাম। অ্যাট টাইমস আই ইভ্‌ন ফরগেট দ্যাট আয়ম আ ইউনাক।"

ঋদ্ধি উঠে দাঁড়াল। খাট থেকে নেমে ত্বিষার মুখোমুখি হল।

"হ্যাভ আ গুড লুক অ্যাট মি ত্বিষা। ভালো করে দ্যাখো আমাকে। বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারছ? আমি আর মানুষ নই ত্বিষা—আয়ম নো লংগার ইওর হ্যাজব্যাণ্ড— আয়ম আ ভেজিটেব্‌ল। ত্বিষা, আমার আবার কষ্ট হচ্ছে—বুঝতে পারছ? আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। ত্বিষা—ত্বিষা!"

ত্বিষা চোখের সামনে এক বীভৎস দুঃস্বপ্ন অভিনীত হতে দেখছিল। অপার্থিব আলোয় সম্পূর্ণ উলঙ্গ ঋদ্ধির শরীর কী মারাত্মক সুঠাম! গ্রিক দেবতাদের মতো তার মেদহীন দেহের সৌষ্ঠব। সে দাঁড়িয়ে আছে স্থির—তার মুখ থেকে মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক শব্দগুলো বেরিয়ে আসছিল। এই প্রথম কিছু ভাবল ত্বিষা। সে দ্বিধায় পড়ে গেল। এই তো ঋদ্ধি! তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মানুষ। কিন্তু এ কোন্ ঋদ্ধি? কাকে এতদিন খুঁজছিল ত্বিষা? তবে কি এ ঋদ্ধি নয়? না—এই তো ঋদ্ধি। ত্বিষার বর—তার প্রেমিক। নাকি প্রেমিক নয়...ঋদ্ধি তো...তবে?

ত্বিষা এই সব ভাবছিল।

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে আসছিল ঋদ্ধির মুখ, "প্রথম দিকে তুমি অফিসে চলে গেলে আমি এইভাবে আয়নার সামনে দাঁড়াতাম। তুমি ভাবতে পারবে না আমি কতখানি হেট করতাম নিজেকে! কতবার নিজেকে আঁচড়ে দিয়েছি। সারা শরীরে খোঁচা মেরেছি অন্ধের মতো! ঘেন্না হচ্ছে না ত্বিষা—বলো, ডোণ্ট য়্যু হেট মি? আমি কিন্তু ঘেন্না করতাম। কতবার ভেবেছি ত্বিষা—বাট আই ওয়জ টু মাচ্ অব আ কাওয়ার্ড টু কিল্ মাইসেলফ!"

ঋদ্ধি হাঁফাচ্ছিল অল্প অল্প। বিছানায় বসল সে।

"অন টোয়েন্টি-থার্ড জুলাই আই টুক দ্য ডিসিশান...তোমার মনে নেই। আমার সব মনে আছে ত্বিষা! সেদিন রাতে আমার শরীরের ভেতরটা চুপ করে ছিল। হোয়েনেভার আই মেড আ মুভ—আমি বুঝতে পারছিলাম যে সাম অবস্ট্যাকল ইজ টু বি ওভারকাম! আর তুমি!"—ঋদ্ধি ত্বিষার কাছে এগিয়ে গেল। ত্বিষা কি একটু শিউরে উঠল ভেতরে ভেতরে? উঠলেও ঋদ্ধি লক্ষ করল না।

"ইউ ওয়্যার প্লেয়িং ইওর পার্ট অ্যাজ স্কিলফুলি অ্যাজ ইউ হ্যাড এভার ডান।"—এবার অল্প হাসল ঋদ্ধি—"তুমি জানো ত্বিষা—ইউ আর মার্ভেলাস ইন বেড।

আমি আগেও বলেছি! কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ কনট্রাস্টটা?" গলা কাঁপতে লাগল ঋদ্ধির।

—"ইউ সি দ্য কন্‌ট্রাস্ট ত্বিষা—ডোণ্ট ইউ? দিস ওয়জ হোয়াট দ্য ডক্টরস হ্যাড প্রেডিক্‌টেড, ইট ওয়জ দ্য রিয়াল বিগিনিং অব মাই ফিজিকাল রেজিস্ট্যান্স... এরপর থেকে যখনই আমি জোর করতাম নিজের এগেন্‌স্টে তখনই আঁমি দেখতাম একটা বিরাট বড় কালো ঢেউ আমাকে ডোবাতে আসছে। ইট ওয়জ দ্য ফাইনাল সিম্পটম। তারপর একদিন আমি বেরিয়ে গেলাম।"

ত্বিষার কোলে মাথা রাখল ঋদ্ধি: "আমার সারা শরীরটা টাচ্ করো ত্বিষা। দ্যাখো, যদি আমি—ইফ আই ক্যান বি অ্যারাউজড। তারপর এসো আমরা খেলি টিল দ্য ক্লাইম্যাক্স। আর দ্যাখো, তারপরে আমি কেমন পাগল হয়ে যাই ব্যথায়, পারসপিরেশানে! খেলবে ত্বিষা? খেলবে?"

শেষ দিকের কথাগুলো ঋদ্ধির জড়িয়ে গিয়েছিল। গলা ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তার চোখে জল ছিল না।

ত্বিষা ঋদ্ধির মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। তারপরে বলল—"না, খেলব না। কিন্তু তুমি ঘুমোবে। ঘুমোও, আমি তোমায় ঘুম পাড়াব।"

তার কণ্ঠস্বরে একটুও কাঁপন ছিল না। ঋদ্ধি তার কোলে মুখ গুঁজল। দুহাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল ত্বিষার কোমর। ত্বিষা আলতো করে তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। আগে যেভাবে দিত—চিরদিন যেভাবে দিয়েছে।

এখন রাত বারোটারও বেশি। বাইরে আবার বৃষ্টি নেমেছে, শীতের তুমুল বৃষ্টি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চারদিক। কেউ যদি এখন পাহাড়ের নিচে মাঠের কাছে যায় তবে দেখবে কেমন করে মাটির বুকে জল জমছে। পাহাড়ের খানা-খোন্দল থেকে কীভাবে জলের ধারা নামছে সব জায়গায়। চুপ করে পড়ে আছে বিসর্পিল কালো পথ। বৃষ্টি ঝরছে অঝোর ধারে। ত্বিষা এসব জানে না। কিন্তু তার কোলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা উলঙ্গ নপুংসক ঋদ্ধির—তার বরের—প্রেমিকের—বুকে, মাথায় এখন নিবিড় বৃষ্টিপাতের পালা চলছে, তার মুখ দেখা যায় না। ত্বিষা তবু তাকিয়ে ছিল তার দিকে। খুব অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, সে ঋদ্ধিকে দেখতে পাচ্ছিল। এ-কি প্রেম, বিশ্বস্ততা না স্নেহ? ত্বিষা পরে ভাববে। এখন সে তার চিরকালীন ঋদ্ধিকে আদর করছে। বাইরে বৃষ্টির তোড়ে মধ্যরাতের সব দৃশ্যই অপার্থিব। এই ঘরের দৃশ্যও তাই।

রাতে আকণ্ঠ মদ খেয়েছিল প্রদীপ আর শুভ্র। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘরের আলো নিভিয়ে একটু গল্প করতে গিয়েছিল শুভ্র। কিন্তু সে দেখল যে প্রদীপ ঘুমে বা নেশায় তলিয়ে গেছে। শুভ্র একটু স্নেহের হাসি হাসল। শালা একেবারে কাঁচা!

ঘুমোনোর চেষ্টা করছিল সে। আগামীকাল গোটা দিন তার অনেক কাজ, সে-সব ছকতে ছকতে একসময় শুভ্র বুঝল যে তার চিন্তাধারা সরলরেখায় এগুচ্ছে না। মাঝে মাঝেই সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে। বুঝল যে আসলে সে অন্য কিছু ভাবতে চাইছে।

একটা খুব অনৈতিক চিন্তা মাথায় এল তার। ঋদ্ধি আর ত্রিধার পুনর্মিলনের দৃশ্যটা ভাবতে চাইছিল সে। বারবার চিন্তাটাকে মাথা থেকে সরালেও সেটাই ফিরে ফিরে আসছিল। এখনও বারোটা বাজেনি। কী করছে ওরা? শুভ্রর শাদা মনে সহজ শারীরিক মিলনের দৃশ্যটাই ভেসে গেল। আবার একবার উত্তেজনা বোধ করল সে। এক পাপবোধে আক্রান্ত হয়ে নিজেকে ধমকাল। পাপের চিন্তা বড় বেয়াড়া; ধমকালে আরো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু একটু পরেই চিন্তাটাকে অন্য দিকে নিয়ে গেল শুভ্র। ওরা ক-দিন থাকবে? এর পর কী করবে?

কাল থেকে তাকে ছুটি নিতে হবে। কাজের খুব চাপ, কিন্তু অন্ততপক্ষে দু-দিন তার চাই-ই। এখানকার একমাত্র দর্শনীয় স্থান নদীর ধার। সেখানে গিয়ে প্রচুর মদ খেয়ে খাবার খেতে হবে। পুরনো গল্পগাছা হবে। প্রদীপকে নিয়ে মজা করা যাবে।

কোথায় একটা যেন মোচড় লাগল তার। আনন্দ করার এই ধরনটি এখন কত গা-সওয়া হয়ে গেছে। অথচ সে একসময় সূক্ষ্ম রুচির লোক ছিল। আহার-নিদ্রা-যান্ত্রিক কাজ আর পানাসক্তির জীবনকে নিয়ে কত ঠাট্টা করেছে। আগে তার একটা তীব্র চোখা কথা বলার ধরন ছিল। নিজের পছন্দ অপছন্দগুলো ভালো করেই জানত সে। এ-ধরনের মানুষের একটা আকর্ষণ থাকে, তারও ছিল। বিশাখা, মৃদুলা—এসব মেয়েদের মুখ—বিশেষত মৃদুলার শরীর তার মনে পড়ল। খুব যৌনগন্ধ ছিল। একবার দুপুরে মৃদুলাদের বাড়িতে হাসতে হাসতেই মৃদুলার সঙ্গে সে কয়েকটা ব্যাপার উপভোগ করেছিল। নেহাতই শারীরিক সমস্ত ব্যাপার। তবে তারা খুব এগোয়নি। বরঞ্চ ওর চেয়ে ইণ্টেলেকচুয়াল বিশাখা অনেক বেশি উত্তেজক ছিল। কবিতা লিখত—প্রচুর চা খেত। পছন্দসই লোকের সঙ্গে শুতে আপত্তি ছিল না। বিশাখাই তার হাতে খড়ি দেয়। এক অদ্ভুত যন্ত্রণার অনুভূতি। একেই বোধহয়

কৌমারন্তে লঘুক্রিয়া বলে। ব্যাপারটা শেষ হবার পর বিশাখা অল্প হেসে তাকে বলেছিল, "একদম বাচ্চা! দেড় মিনিটেই খেল খতম্, যাঃ!"

খুব অপমানিত বোধ করেছিল শুভ্র। প্রথম যৌনতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞসুলভ রোমান্টিক ধারণাগুলো চলে গিয়েছিল।

কিন্তু আবার কেন এসব ভাবছে সে? ত্বিষা এ-কী ক্ষতি করল তার! যত রাজ্যের উদ্ভট খারাপ চিন্তা মাথায় আসছে। ষোল-সতের বছর বয়সের মতো।

এখন পৌনে বারোটা বাজে। বৃষ্টি চলছে বাইরে, তবে বেগ কম। পাশে ঘুমন্ত প্রদীপের দিকে চোখ পড়ল তার। ও একদম বদলায়নি। সারা বিকেল আর রাতের একনাগাড় গল্পে এতদিন বাদে দেখা হওয়ার আমেজটা থিতিয়ে এসেছিল। প্রদীপের কথা ভাবতে ভাবতে ওকে কিছুটা ঈর্ষাও করল সে। ওর মতো একটা স্কুল-মাস্টারি করে জীবন কাটাবার কথা শুভ্র ভাবতে পারে না। তা সত্ত্বেও ওর কলকাতার জীবনটা পেলে সে বোধহয় খুশি হত। অন্তত এখন তো তাই মনে হচ্ছে। মানুষ যে কত কিছু চায়!

হঠাৎ তার মনে পড়ল, দু-একদিনের মধ্যেই ঋদ্ধি-ত্বিষা চলে যাবে। প্রদীপ হয়তো আরও কিছুদিন থাকবে। তারপর? এক বিকট শূন্যতাবোধ তাকে গ্রাস করল। ব্যগ্র হয়ে ঘুমন্ত প্রদীপের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগল সে।

বহুদিন পরে শুভ্রর মনে পড়ল তার মাকে। মা এখন ব্যাঙ্গালোরে বড় ছেলে অভ্রের সঙ্গে থাকে। বাবা মারা যাবার আগে পর্যন্ত লেক গার্ডেন্সের বাড়িতেই ছিল মা। শুভ্র যখন ফ্রান্সে তখন বাবা মারা যায়। কলকাতার পাট তুলে মা এখন ব্যাঙ্গালোরে। দাদা, বৌদি আর রিনির সঙ্গে। ভালো আছে। সে-জন্যেই শুভ্র কখনও তাকে এখানে আসতে বলেনি। আর তার তো এখন ব্যাঙ্গালোর যাবার প্রশ্নই আসে না।

মা মাঝে মাঝে চিঠি দেয়। শুভ্রর বিয়ে নিয়েও ভাবছে। এমনকী (এইখানে শুভ্র একটু হাসল) দু-একটি মেয়েও দেখেছে মা, ওখানকার। তাদের মধ্যে একজন—ঋতা বা লতা বা শ্রীপর্ণা—কারো একটি ছবি মা পাঠিয়েছিল। ছবির মেয়েটি দেখতে মন্দ নয়। পড়াশুনো করেছে—একটা চাকরিও করে ওখানে। কিন্তু শুভ্র এভাবে এক্ষুনি বিয়ে করতে চায় না। এদিকে এখানকার এই গুমোট জীবন মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে। রাতে হঠাৎ জেগে ভীষণ একা লাগে কখনও। কিন্তু বিয়ে করলে কি সেই একাকিত্ব বেড়ে যাবে না আরো? প্রদীপ চিঠিতে লিখেছিল—বেড়ে যাবে। শুভ্র তেমন তলিয়ে এখনও ভাবেনি।

তবে একটা ছবির মেয়েকে বিয়ে করলেই হয়। পরিচয় না-হয় পরে হবে। এ তো দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে। সবাই কি তেমন অসুখী? তা কেন হবে? তাছাড়া এ-প্রশ্ন মাথায় এলে আরো মনে হয়—সুখ কী? কোন্ সুখ চায় শুভ্র? নাকি সে খালি রেহাই চায়? এই দমবন্ধ জীবন থেকে—রাতে আকণ্ঠ মদ খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ার থেকে—এই সব কিছু থেকে কোন্ ধরনের রেহাই খুঁজছে শুভ্র? ভাবতে ভাবতে মাথা গুলিয়ে আসে। টলটলে নেশা কেটে যেতে চায়। ভয় হয় ঘুম আসবে না আর রাতে। অথচ কাল সারা সকাল পড়ে আছে। ঠিক আজকের মতোই একটা রাত পড়ে আছে সামনে। শুভ্র তাই ভাবে না। সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমোতে ঘুমোতে প্রদীপ—ঋদ্ধি—ত্বিষা—প্রোডাকশান ম্যানেজার—বেটি আর মদনের মুখ মিলেমিশে যেতে থাকে। কখনও একটা মুখ ভেসে ওঠে—অন্যটা নেমে যায়। একটু হাত ছড়ালে প্রদীপের শরীরে কোথাও লাগে। আচ্ছন্ন এক অনুভূতি হয় শুভ্রর। সে কান পাতলে প্রদীপের নিশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পায়। প্রায় ঘুমন্ত শুভ্রর ভেতরে কোথাও একটা স্বস্তির অনুভূতি জাগে। এরকমভাবে একসময় শুভ্র ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে শুভ্রর জিপ ছাড়ার শব্দ শুনছিল প্রদীপ। কারণ মদ খেয়ে গভীর ঘুম হলেও অল্প শব্দেই সেই ঘুম ভেঙে যায় তার। কেমন এক ধরনের অস্বস্তি হতে থাকে। পায়ের পাতা গরম হয়ে যায়। এরকমই এক মুহূর্তে প্রদীপ জেগেছিল। হিসি করেছিল। ফিরে এসে জল খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘুম আর আসছিল না। অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে একসময় সে উঠল। তখন সাতটা বাজে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করতে করতে সে চারদিকটা ভালো করে দেখে নিল।

কোয়ার্টারগুলোর ঘুম ভেঙেছে, তবে পুরোপুরি নয়। কাল রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টির পর আজ সকালটা বেশ চনমনে মনে হচ্ছে। এখানে বৃষ্টির পরে কাদা জমে না। চারদিকে বেশ একটা শরৎ-শরৎ গন্ধ ভাসছে। প্রায় কলকাতার মতোই। "আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে" গাইতে খুব ইচ্ছে করল প্রদীপের। কিন্তু মুখে ফেনা ছিল।

ঋদ্ধি-ত্বিষার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। একটু বাদে চা-টা খেয়ে ওদের ওখানে চলে গেলে কেমন হয়?—ওদের পুনর্মিলনের ব্যাপার-স্যাপার এতক্ষণে চুকে গেছে নিশ্চয়। শুভ্র বলেছিল আজ দুপুরে চলে আসবে—কাল গোটা দিন ছুটি নেবে। তাহলে দেড়খানা দিন বেশ সবাই মিলে একসঙ্গে কাটানো যাবে।

কাল রাতে শুভ্র শোয়ার পর গল্প জমানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আগের দিনে ট্রেনের ধকল, সারাদিন হাঁটাহাঁটি আর ভরপেট মদ প্রদীপকে কাহিল করে দিয়েছিল। শোবার একটু পরেই শুভ্রর কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল।

মুখ ধুয়ে পোশাক বদলে বেরিয়ে পড়ল প্রদীপ। প্রথমে ঠিক করেছিল ক্যান্টিনে চা খাবে। পরে ভাবল দেখা যাক রাস্তায় চায়ের দোকান আছে না কি—এত ভালো একটা সকালে ক্যান্টিনে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না।

কালো পিচের রাস্তা বৃষ্টিতে ভিজে চকচকে। ডান দিকে দূরে ফ্যাক্টরির চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। আর আরও দূরে বাঁ-দিকে পাহাড়গুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে ওদের।

সোজা হাঁটতে লাগল সে। একটাও গাড়ি যাতায়াত করছে না এখন। শুধু মাঝেমাঝে সাইকেলে চড়ে কেউ কেউ যাচ্ছে স্টেশানের দিকে। এরই মধ্যে একটা সাইকেলের পেছনে মস্ত একটা ঝোলা ছিল দড়ি দিয়ে বাঁধা। যে লোকটা চালাচ্ছিল তার কাঁধে একটা ঝোলা। তার ভেতর থেকে গান ভেসে আসছিল তারস্বরে—"অন্ধেরি রাতো মে—সুনসান রাহোঁ পর।" শারদ প্রাতে এই উৎকট দৃশ্যে অল্প বিরক্ত হল প্রদীপ, আবার কেন যেন মজাও পেল।

রাস্তা দিয়ে মাঝেমাঝেই যাতায়াত করছিল আদিবাসীরা। তাদেরই কাছে জিগ্যেস করে একটা চায়ের দোকানের হদিশ পেল প্রদীপ। তবে আরো কিছুক্ষণ হাঁটতে হল।

পিচের রাস্তা যেখানে গিয়ে বাঁ-দিকে মেঠো পথে মিশেছে, তারই মোড়ে কয়েকটা ছোট ছোট দোকান। বেশিরভাগই চাল-ডাল-আনাজের। তবে একটা চায়ের দোকানও আছে। একটা বুড়ো সেই দোকানের বাইরে মাটির উনোনে বিরাট একটা গামলায় চায়ের জল চাপিয়েছিল। বুড়োকে দেখে মনে হচ্ছিল না ওর চা বিক্রি করার কোনো ইচ্ছে আছে। দোকানের ঠিক মাঝখানে একটা বড় বাক্সের ওপরে বসে সে ঝিমোচ্ছিল। প্রদীপ তাকে চায়ের কথা বলতে বুড়োর ঘুম ভাঙল। প্রদীপের ঠিক মুখের কাছে মুখ এনে বলল—"কেয়া চাহিয়ে?"

ছিটকে সরে এল প্রদীপ। এত সকালেই লোকটার মুখে ভরভরে মদের গন্ধ। প্রদীপ একটু দূর থেকেই এবার চায়ের কথাটা আবার বলল। লোকটা বলল—"হোগা।"—বলে আবার ঝিমোতে লাগল।

দোকানের ঠিক বাইরেই একটা গাছের গুঁড়ি ফেলা। তার ওপর বসল প্রদীপ। আশেপাশের দোকান থেকে অনেকেই তাকে দেখছিল। এই দৃষ্টি বিশ্লেষণ করে

প্রদীপ বুঝতে পারল যে এর মধ্যে প্রধানত তিন ধরনের অনুভূতি কাজ করছে। সন্দেহ, লোভ আর উদাসীনতা। আদিবাসীদের মধ্যে শিশুসুলভ সারল্য থাকে বলে প্রবাদ আছে। কিন্তু বহুবার বাইরে—সাঁওতাল পরগনার একেবারে ভেতরে গিয়েও প্রদীপ তা কখনও দেখেনি। অন্তত্তপক্ষে শহরের লোকেদের সঙ্গে ব্যবহারে তা কখনও প্রকাশ পায় না। সেখানে সেই একই ধরনের সন্দেহ—অবিশ্বাস, লোভ - যতটা সম্ভব ঠকাবার। আর উদাসীনতা—একেবারেই গুরুত্ব না দেবার। গত কয়েকশ বছরে শহর ওদের প্রেম-ভালবাসা স্নেহ সব ছিবড়ে করে দিয়েছে। এমনকী প্রবাদপ্রতিম সরল, বন্য আদিবাসী মেয়েদেরও ফোঁপড়া করে দিয়েছে। কারণ প্রদীপ নিজে সে ধরনের মেয়ে দেখেনি, যাদের দেখে অতীতে ভুল ভেবেছে—পরে জানতে পেরেছে তারা সবাই বেশ্যা একসময় শহরেরই কেউ না কেউ তাদের ভালবেসেছিল।

অতএব পরিস্থিতিটা প্রদীপের পক্ষে মোটেও সুবিধের হল না। তাই সে মুখ সরিয়ে বুড়োর চা করার দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা দেখল। এর মধ্যে বেলা বেড়েছে। আরও দু-তিনজন লোক এদিক-ওদিক থেকে জমা হয়েছে। সবাই আদিবাসী নয়। কাছাকাছি শহর থেকে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে আসে। অনেকে আবার শহরে যাচ্ছে চাকরি করতে। এরা বেশ উচ্চস্বরেই নিজেদের মধ্যে গল্প করতে লাগল। বেশিরভাগ গল্পই অশ্লীল। এরই মধ্যে পরস্পরের পিঠ চাপড়ে রসিকতাও আছে। এ-ধরনের শারীরিক ঠাট্টা বা চিৎকার করে মজা করা প্রদীপের ভালো লাগে না। তবে প্রদীপ এদের সহবৎ শেখাবে না।

এরা যতক্ষণ গল্প করছিল ততক্ষণ এদের দৃষ্টি ছিল প্রদীপের ওপর। এতে তার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। অবশেষে চা এল। খুব খারাপ নয়। কলকাতায় এর চেয়ে অনেক খারাপ চা খেয়েছে প্রদীপ। চা খেতে খেতেই ওদের মধ্যে একজন প্রদীপের সঙ্গে কিছু কথা বলল। প্রদীপ তার মারাত্মক হিন্দিতে কিছুক্ষণ আলাপ চালিয়ে গেল। লোকটার নাম রঘুনাথ সিং—স্টেশনে চায়ের দোকান আছে।

অবশেষে উঠল প্রদীপ। তখন সাড়ে আটটা বাজে। ফেরার পথে দেখল, রাস্তা এবার জমজমাট—অনেক লোকজন, গাড়ি যাতায়াত করছে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় গেস্ট হাউসে পৌঁছল প্রদীপ। ঢোকার মুখেই দেখল ব্যালকনিতে ঋদ্ধি দাঁড়িয়ে আছে—অনেক দূরে তাকিয়ে। পাশে ত্বিষা নেই। খুবই স্বাভাবিক দৃশ্য –কিন্তু প্রদীপের কেমন যেন অদ্ভুত লাগল।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। বাইরে শব্দ করল প্রদীপ। ঋদ্ধিই এসে দরজা খুলে দিল। অল্প হেসে বলল—"আয়।"

কোথায় যেন একটা হিসেবের গণ্ডগোল হচ্ছে। প্রদীপ যে বিশেষ কিছু বুঝতে পারছে তা নয়। তবে তার ইন্সটিংক্টে খোঁচা লাগছে।

"ত্বিষা কোথায় ?" চটি ছেড়ে খাটে বসল প্রদীপ।

"বাথরুমে।" ঋদ্ধি তার মুখোমুখি বসল।

"তারপর—কাল রাতটা কেমন কাটল?—এতদিন পর?" প্রদীপ ঋদ্ধির মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

"বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।"—ঋদ্ধি আলতো হেসে বলল।

"আর ভেতরে!"

"ভেতরে হচ্ছিল না।"—ঋদ্ধি চেষ্টা করছে স্বাভাবিকভাবে কথা চালিয়ে যেতে। কিন্তু প্রদীপ বুঝল যে ও আসলে অন্যমনস্ক। এরকম অবস্থায় কথাবার্তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায় না। তাই দুজনেই অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। শেষে ঋদ্ধি বলল..."কেমন আছিস ?"

"ঠিক আগের মতোই"—বলে একটা সিগারেট ধরাল প্রদীপ। একটু সময় নিল আর কি। তারপর বলল—"আর তুই কেমন আছিস সেটা জিগ্যেস করার সময় হয়েছে কি ?"

গম্ভীর হল ঋদ্ধি। বলল "হয়েছে। তবে আমার উত্তর দিতে আর একটু সময় লাগবে।" বলে খুব ভালো করে প্রদীপের দিকে তাকাল সে: "বলব। তোকে বলব।"

এরপর ঋদ্ধি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এবার প্রকাশ্যেই। তার দৃষ্টি চলে গেল ঘরের জানালার বাইরে—শূন্যতায়।

একটু পরেই ত্বিষা বাথরুম থেকে ঘরে ঢুকল। এর মধ্যেই স্নান সেরে নিয়েছে সে। খুব খুশি হল প্রদীপকে দেখে—"কখন এসেছিস ?" —ত্বিষার ভিজে চুল খোলা। সে খাটের ওপর বসল ঠিক পাখার নিচে। ঋদ্ধির একটা পা সেখানে ছিল। সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। ঋদ্ধি একবার তাকাল। তারপর আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

"একটু আগে এসেছি। সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে বেরিয়ে চা খেলাম। তারপর ভাবলাম, তোদের সঙ্গে দেখা করে আসি। এতক্ষণে নিশ্চয় তোদের সাড়ে তিন মাসের ঘোর কেটেছে ?"

"পুরোপুরি কাটেনি—কী কেটেছে ?" —ঋদ্ধির পায়ে চিমটি কাটল ত্বিষা। ঋদ্ধির তড়াং করে উঠে বসায় বোঝা গেল, বেশ লেগেছে তার। ত্বিষার পিঠে আলতো করে বাঁ হাত দিয়ে ধাক্কা মারল সে। তারপর বলল—"এই চিমটি খেয়ে কাটল।"

প্রদীপ আর ত্বিষা হেসে উঠল। আশ্বস্ত হল প্রদীপ। বছরখানেক আগে ত্বিষাদের রিচি রোডের ফ্ল্যাটে এরকমই সময় কাটত মাঝে মাঝে। তাহলে নিশ্চয় সব ঠিক আছে। আসলে দাম্পত্য জীবনে হাজার সমস্যা। বড়টা মিটে গেলে ছোটগুলো মাথা তোলে। এসব সে কোনোদিনই বুঝবে না।

"শুভ্র কোথায় ? অফিসে গেছে ?" ত্বিষা জিগ্যেস করল প্রদীপকে।

প্রদীপ বলল "হ্যাঁ। তবে দুপুরেই চলে আসবে বলেছে, আর কাল ছুটি নেবে।"

"তারপর আমরা পিকনিকে যাব নদীর ধারে"—কথাটা বলল ঋদ্ধি। এমন ভাবে, যেন প্রদীপের দিকেই তাকিয়ে আছে সে। কিন্তু আসলে প্রদীপকে দেখছিল না।

"হ্যাঁ—তাই তো বলছিল।" —প্রদীপ বলল। ঋদ্ধির কথার ধরনটা একটু অদ্ভুত লাগল তার।

"আমায়ও একদিন নিয়ে গিয়েছিল শুভ্র। ভারি সুন্দর জায়গাটা। তবে তখন তিষ্টি ছিল না। এবার আমার আরো ভালো লাগবে।" —বলে ত্বিষার হাতটা ধরে তার কোলে মাথা রাখল ঋদ্ধি। ত্বিষা উঁ করে মুখ ভ্যাঙাল তাকে।

"তোদের বিবাহিত জীবনটা চিরকালই আমার কাছে আইডিয়াল।" —প্রদীপ বেশ মুগ্ধ চোখে ওদের দেখছিল—আগের মতোই।

"সাড়ে তিন মাস আমাদের মতো কাটলে বুঝবি মজা কাকে বলে! অল বল্‌স! দিল্লি কা লাড্ডু!" —ঋদ্ধি অসহায়তার ভান করল।

"তা-ও আমি খেয়েই পস্তাতে চাই। তবে ত্বিষার মতো একটা বউ কোথায় পাই বলতো ?"

'দ্যাখো দ্যাখো—দেখে শেখো!' —ত্বিষা ঋদ্ধির চুল ধরে টানল।

ঋদ্ধি রেগে যাবার ভান করে বলল—"আমার খুব লেগেছে। দারুণ পেটাব কিন্তু!"

এবার দার্শনিকের চোখে ওদের খুনসুটি দেখতে লাগল প্রদীপ।

হঠাৎ ত্বিষা বলল—"এই তুই ব্রেকফাস্ট করেছিস ?"

"না,"—প্রদীপ বলল। তার খিদেও পায়নি।

"ঋদ্ধি, তুমি গিয়ে চৌকিদারকে বলো না আমাদের ব্রেকফাস্ট পাঠিয়ে দিতে।"

ঋদ্ধি উঠল -সামনে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করল—"যো হুকুম শাহ্‌জাদি!" সে বেরিয়ে গেল।

"কদিন থাকবি তোরা এখানে?" প্রদীপ জিগ্যেস করল।

ত্বিষার চুল শুকিয়ে গিয়েছিল। সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল..."শুভ্র তো আর তিন দিনের বেশি থাকতে দিতে চায় না—দেখি কী করা যায়!"

প্রদীপ তড়বড় করে উঠল "আরে না না। আসলে এখানে একবারে তিনদিনের বেশি বুকিং হয় না -তবে রিনিউ করিয়ে নেওয়া যায়। শুধু যারা ইনভাইটেড তাদের বুকিং লাগে না"...বলতে বলতে থেমে গেল প্রদীপ। ত্বিষা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

"তুই এখনও একই রকম আছিস। এত এক্সপ্লেন করার কোনো দরকার আছে? তুই এখনও সেই ভালোমানুষ টাইপের।"

"তুই ইনডিরেক্টলি আমাকে বোকা বলছিস!"—প্রদীপ রাগের ভান করল।

"না—ডিরেক্টলি বলছি! বাজে বকিস না। আসলে কদিন থাকব এখনও ঠিক করিনি। আজ ঠিক্ করব। তুই কদিন থাকছিস?"

"অ্যাট লিস্ট দশ দিন। এতাদিন বাদে শুভ্রকে পেয়েছি!"

"কলকাতায় ফিরেই কিন্তু আমাদের বাড়ি যাবি, মানে আমাদের নতুন বাড়িতে!" ত্বিষার চুল আঁচড়ানো শেষ, আবার সে খাটে এসে বসল।

"গিয়ে কী লাভ? তোরা তো পাত্তাই দিস না। আসলে আমি একটা দুঃস্থ স্কুলমাস্টার..." প্রদীপ করুণ গলায় বলল।

"ছোটলোক কোথাকার—মেরে ফেলব একেবারে।"

ত্বিষা হাত তুলল।

নাটকীয় ভঙ্গিতে ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকল চৌকিদার। তার হাতে ট্রে-ভর্তি খাবার। পেছনে আর একটা ট্রেতে করে চা নিয়ে ঢুকল ঋদ্ধি।

"তোদের প্রেমালাপ থামা। চা খেয়ে নে আগে।"— ঋদ্ধি বলল।

"কী হচ্ছেটা কী?"— ত্বিষা ঝাঁকিয়ে উঠল। তারপর বাকিটা ইংরেজিতে বলল—"দেখছ না ও রয়েছে?" —"ও" মানে চৌকিদার।

লজ্জায় কান ধরার ভান করল ঋদ্ধি। হাতের ট্রে, টি পট, কাপ সব ঝনঝন করে উঠল। ত্বিষা লাফিয়ে উঠে সেগুলো ধরল। তারপর আস্তে আস্তে সবগুলো

রাখল খাটের ওপর। চৌকিদারই খবরের কাগজ বিছিয়ে দিয়েছিল। জিনিসগুলো রেখে ত্বিষা ঋদ্ধির দিকে রাগের চোখে তাকাল। তারপর ইংরেজিতে বলল, "ও (চৌকিদার) একবার যাক। তারপর দ্যাখো তোমায় কী করি!"

খাবারের প্লেটগুলো রেখে চৌকিদার চলে গেল। ত্বিষা উঠে ঋদ্ধির চুল মুঠো করে ধরল : "তখন ওরকম বদমাইশি করছিলে কেন?"

তারা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। এক মুহূর্ত। কিন্তু আসলে অনেক দিন। কয়েকটা বছর। মানুষ ভুল করে। তাই দুজনেই ভাবছিল।— আসলে কিছুই হয়নি। সব সেই আগের মতো...

এসব কিছু বুঝল না প্রদীপ। সে খুব আনন্দে ছিল। সারাজীবন চার পাশের সবাই ভালো থাকলে—কাছে থাকলে, কী ভালোই না হতো! সে একটা চামচ দিয়ে টুং-টুং শব্দ করছিল প্লেটে।

৭

মনটা বেশ হালকা লাগছিল শুভ্রর। ভেবেছিল, খুব খিটিমিটি কিছু ব্যাপার হবে। কিন্তু তার দেড়দিনের ছুটি মঞ্জুর হল। তারপর প্রোডাকশান ম্যানেজারের সঙ্গেও সময়টা মন্দ কাটেনি। লোকটা এলোমেলো দু একটা কথা বলে চট করে ক্ষমা চেয়ে নিল। একদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল, বেটি নাকি নিজেই ক্ষমা চাইবে। এটা একটু অভিনব। এছাড়া প্রোডাকশান ম্যানেজার আরো কিছু খোঁজখবর নিল—বাড়ির, বাবা-মার। ব্যাপারটা ভালো লাগল না শুভ্রর। পপ-এর কাছে বেটির সর্বশেষ চাহিদা কি শুভ্রই? ওরেব্ বাবা! সে ভাবাও যায় না!

যাই হোক, একটু ফুরফুরে মনেই বেরিয়ে আসছিল শুভ্র: আজ হেঁটেই যাবে সে। সোজা গেস্ট হাউস—সেখানে লাঞ্চ সেরে আড্ডা।

কিন্তু যখন গেট দিয়ে বেরোচ্ছে, তখনই একটা প্রিমিয়ার পদ্মিনী এসে থামল। গাড়িটা দেখেই বুক ছ্যাং করে উঠেছিল শুভ্রর। এরকম গাড়ি এ-অঞ্চলে একজনই চালায়।

তার ভয় মিথ্যে ছিল না। গাড়ি চালাচ্ছিল বেটিই। সকালের আকাশের সঙ্গে ম্যাচ করে সে একটা আকাশী রঙের শাড়ি পরেছে, চুল খোলা। সেজেছে—কিন্তু লুকিয়ে। এমনিতে মন্দ লাগছিল না। শুধু ওই শাড়ি পরার ধরনটাই সব মাটি করল। নাভির অন্তত দু-ইঞ্চি নিচে শাড়ি। পেছন থেকে বেটিকে কেমন লাগবে ভাবল শুভ্র। এখনকার মেয়েরা কী করে সাবেকি মেয়েদের মতোই নিতম্ব দোলায়, বুঝতে পারে না সে। তবে এদের নিতম্ব অবশ্য অত স্থূল নয়।

তাদের চোখাচোখি হতে সে ক্যাজুয়ালি হাত তুলে "হাই" বলে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু বেটি গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে তাকে ডাকল। বহুদিন পরে এই প্রথম বেটির বাহুমূল দেখতে পেল না শুভ্র। বেটি একটা আকাশী রঙের—স্লিভস দেওয়া ব্লাউজ পরেছে। তার মুখ একটু গম্ভীর। সে শুভ্রকে বলল—"আই ওয়ন্ট্ টোক টু য়্যু।"

শুভ্র বোঝানোর চেষ্টা করল যে তার গেস্টরা তার জন্য অপেক্ষা করছে। বেটি বলল—"দে ক্যান ওয়েট।"—বলে খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সামনের দরজা খুলল।

শুভ্রর খুব ইচ্ছে করছিল মেয়েটাকে ধরে চড়াতে। বা নাহলে নিছক অপমান করতে। কিন্তু কোনোটাই সম্ভব নয়। তার হয়ে অ্যাপলজি চাওয়ার মতো কোনো বাবা এখানে নেই। তাছাড়া সে পিছন না ফিরেও বুঝতে পারছিল যে অনেকেই তাদের দিকে লক্ষ রাখছে ফ্যাক্টরি থেকে। অগত্যা সে গাড়ির দিকে এগোল।

সে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিল। বেটি বলল— "ডোণ্ট বি সিলি, কাম হিয়ার!"—বলে সে নিজের বাঁ-দিক দেখাল। আবার একটা চড় মারার ইচ্ছে দমন করে শুভ্র মুখ বুঁজে গাড়িতে উঠল। বেটির পাশে বসে দরজা বন্ধ করতে-না করতেই গাড়ি ছেড়ে দিল বেটি।

শুভ্র বেটিকে বলতে যাচ্ছিল যে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার আগেই বেটি একটু এগিয়ে রাস্তার এক কোণে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। শুভ্রর দিকে তাকিয়ে একেবারে সাহেবি সিনেমার নায়িকাদের মতো বলল— "আয়াম স্যরি।"

এরপর তাদের আলোচনা বিভিন্ন দিকে মোড় নিল। হিন্দি এবং ইংরেজি মেশানো এই কথাবার্তার কিছুটা এখানে বাংলায় দেওয়া যেতে পারে।

বেটি : তুমি কবে আমাদের বাড়ি আসছ?

শুভ্র : যাব। শিগগিরই যাব।

বেটি : কাল এসো।

শুভ্র : কাল হবে না। অন্য কোনো একদিন।

বেটি : তাহলে রোববার? নাহলে আমি রাগ করব।

শুভ্র : (মনে মনে 'স্-আলা' বলে) চেষ্টা করব।

এরপর বেটি চুপ করে রইল। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর দু-হাত রেখে খুব দুঃখী মুখে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

শুভ্র উদাসীনভাবে একটা সিগারেট ধরাল। বেটির গা থেকে হাল্কা পারফিউমের গন্ধ আসছিল। তার দু হাত দেখল শুভ্র। খুব শাদা। হাল্‌কা করে নেলপলিশ লাগানো হাতের আঙুলে। শুভ্র হঠাৎ ভাবল ওর আঙুলে যদি সিগারেটের একটা ছ্যাঁকা দেওয়া যায় তাহলে কি সেটা খুব খারাপ হবে? কী করবে বেটি?

শুভ্রর সিগারেট আধখানা শেষ হল। বেটি এবার শুভ্রর দিকে মুখ ঘোরাল। তার এবারের দৃষ্টি একেবারেই আবহমান হিন্দি ছবির নায়িকার মতো। ডানপিটে নায়িকারা যখন শায়েস্তা হয়ে সৎ প্রেমিকের কাছে ফিরে আসে, তখন যেভাবে তাকায়—ঠিক সেভাবে তার দিকে তাকাল বেটি। এবং শুভ্র লক্ষ করল যে তার দু-চোখে দু-ফোঁটা জল। শুভ্র পারলে মেয়েটার পিঠ চাপড়ে দিত। কিন্তু সে আরও উদাসীন হবার ভান করল।

বেটি: আমি তোমায় ভালবেসে ফেলেছি।

শুভ্র: ও (আই সি)।

বেটি: আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই।

শুভ্র সিগারেটটা প্রায় গিলে ফেলেছিল। নিজেকে সামলে সে দু-মিনিট আকাশ-টাকাশ দেখল। তারপর বেটির উদ্‌গ্রীব মুখের দিকে চেয়ে বলল:

তুমি সত্যি আমাকে ভালবাসো?

বেটি: জীবন বাজি রেখে বলতে পারি।

ইংরেজিতে উক্তিটি এতটা জোলো শোনায় না। তবু শুভ্র হা-হা করে হেসে উঠতে চাইছিল। তা না করে বলল, তবে একটা কাজ করো। আমায় বিয়ে করতে চেয়ো না। বিয়ে আর ভালবাসা একসঙ্গে যায় না। নিৎসে বলেছেন।

বেটি: মোটেও নিৎসে বলেননি।

শুভ্র: তাহলে শ' বা ফ্রয়েড, কিন্তু যেই বলুন, কথাটা ঠিক। বিয়ে করে ভালবাসা যায় না।

বেটি: আমরা একসেপ্‌শানাল হব।

শুভ্র: আমি খুব অর্ডিনারি।

বেটি: তুমি আমায় এড়িয়ে যাচ্ছ।

শুভ্র: মোটেও না। তুমি আমায় ভালবাসছ জেনে আমার খুব ভালো লাগছে। কিন্তু বিয়ে ভালবাসা খেয়ে ফেলে।

বেটি: আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

শুভ্র: আমি দুঃখ পাচ্ছি সেইজন্যে। তবে এখন আমায় যেতে হবে। আমি

একদিন তোমার বাড়ি গিয়ে সব বুঝিয়ে দিয়ে আসব। এখন যদি তুমি দয়া করে গেস্ট হাউসের সামনে ছেড়ে দাও, খুব ভালো হয়।

ফেরার সময় বেটি বারবার শুভ্রর দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু শুভ্র চুপ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। শিগগিরই গেস্ট হাউস এসে গেল। নেমে যেতে যেতে শুভ্র শুনল, বেটি তাকে ডাকছে। সে ফিরে তাকাল।

বেটি : প্লিজ, এই রোববার এসো!

শুভ্র : শিগগিরই যাব!

বেটি আবার সজল চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। কী করে মেয়েটা এত চট করে চোখে জল আনে কে জানে? আর ভাবল না শুভ্র। সে "সিয়্যা" বলে এগিয়ে গেল।

একটু পরে গাড়ি ছাড়ার শব্দ। তারও একটু পরে যখন পেছন ফিরল শুভ্র তখন বেটির গাড়ি দূরে চলে গেছে।

একটা বিশাল নিশ্বাস ছাড়ল শুভ্র। এখনকার মতো সে বেঁচে গেছে। কিছু দিনের মধ্যেই বেটি নিশ্চয় অন্য কারো প্রেমে পড়ে যাবে।

বাইরে থেকেই ওদের গলা শুনতে পাচ্ছিল সে। তাই সোজা ঢুকে পড়ল। ঋদ্ধি ত্বিষা খাটের একদিকে—অন্য এক কোণায় প্রদীপ। প্রায় একই সঙ্গে "আয়, আয়" বলে ডেকে উঠল ওরা।

অর্থাৎ বেশ জমিয়ে এতক্ষণ আড্ডা হচ্ছিল। শুভ্র প্রদীপের পাশে বসল। একটা হাঁক ছেড়ে বলল—"তোরা বেশ আড্ডা মারছিস। আর আমি পড়েছিলাম বিপদে!"

সবাই বেশ উদ্‌গ্রীব হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। শুভ্র পুরো ঘটনাটা খুলে বলল। প্রায় পনের মিনিট ধরে নানারকম "হুঁ-হুঁ" "তারপর" "সে কীরে!" এবং শেষে প্রচণ্ড হাসির মধ্যে দিয়ে শেষ করতে হল তাকে। গল্প শেষ করে শুভ্র দেখল ত্বিষাকে—সে ঋদ্ধির কাঁধে মুখ গুঁজে হাসছে। প্রদীপ তার স্বভাবসিদ্ধ দুর্বল হাসি হাসছে। কিছুক্ষণ নানারকম মন্তব্য শোনার পর শুভ্র বলল, "ভীষণ খিদে পেয়েছে—খেতে চল্। দাঁড়া আমি চৌকিদারকে বলে আসি!"

"তুই বোস, আমি ব্যবস্থা করে আসছি।"—বলে প্রদীপ বেরিয়ে গেল।

দু-মিনিটের নীরবতা। প্রদীপ যেন এক সেতুর কাজ করছিল এতক্ষণ। এটা বুঝতে পেরে শুভ্র বলল: "সব ব্যবস্থা পাক্কা। কাল সকালে ঠিক ছটায় আমি জিপ নিয়ে আসছি। সাতটার মধ্যে ওখানে পৌঁছুলে ভালো হয়।"

"খাবারদাবার কী হবে ?" ত্বিষা জিগ্যেস করল।

"সব শুকনো খাবার নেব। সে-সব তোদের ভাবতে হবে না। ক্যান্টিন থেকে আমিই ব্যবস্থা করে নেব। কিন্তু ছ-টার মধ্যে তোদের রেডি থাকতে হবে !"

ঋদ্ধি বলল, "আমি স্নান করে আসি, বুঝলি ? আমারও খিদে-খিদে পাচ্ছে। সাড়ে-এগারোটা বাজে প্রায়।" তোয়ালে-টোয়ালে গুছিয়ে ঋদ্ধি বাথরুমে ঢুকে গেল।

এখন ঘরে শুভ্র আর ত্বিষা। শুভ্র দেখল ত্বিষাকে আরো সুন্দর লাগছে। ভেতরে কোথাও একটা ভালো লাগার অনুভূতি হল তার। ত্বিষা ভালো থাকুক।

"তোদের একটা জরুরি কথা জিগ্যেস করার ছিল।" শুভ্র বলল, "তোরা কদিন থাকবি যদি জানাস, তবে কালই আবার গেস্ট হাউসে বুকিং রিনিউ করিয়ে নিই।"

"আসলে আমরাও কিছু ঠিক করিনি এখনও। আজ রাত্তিরে ঠিক করব। তুই কালই জানতে পারবি। তবে ..." ত্বিষা হঠাৎ থেমে গেল।

"বল্..."শুভ্র তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু চোখে।

"বোধ হয় আমরা কালই যাব। আমার অন্তত সে রকমই ইচ্ছে। কলকাতায়, বুঝতেই পারছিস—ফিরে গিয়ে হাজার ঝামেলা মেটাতে হবে।" ত্বিষা একটু চিন্তিত মুখে বলল। শুভ্র কী উত্তর দেবে বুঝতে পারছিল না। সে এখনও জানে না ওদের সমস্যাটা আসলে কী ছিল ? ওরা নিজে থেকে না বললে জিগ্যেসও করতে পারবে না। তাই চুপ করে রইল।

প্রদীপ ঘরে ঢুকল, "আধ ঘণ্টার মধ্যেই খাবার রেডি হয়ে যাবে। ঋদ্ধি কোথায় ?"

"স্নান করতে গেছে।" শুভ্র বলল। প্রদীপ খাটে বেশ জুতসই হয়ে বসে বলল "তোরা কিছু দেখালি ভাই ! এজন্যেই আমার দ্বারা বিয়ে-ফিয়ে হবে না। কে শালা এত ঝামেলা পোয়াবে ?"

ত্বিষা হাসল, "বিয়ে কর না, তখন বুঝতে পারবি কে ঝামেলা পোয়ায় ?"

প্রদীপ ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল "না না। আমার কথা ছাড়। বরং শুভ্রকে একটা ভালোগোছের মেয়ে জুটিয়ে দে। এখানে এভাবে থাকলে ছেলেটা পাগলা হয়ে যাবে !"

"কেন, ওকে তো বেটি ভালবেসে ফেলেছে !" ত্বিষা একবার শুভ্রকে দেখে নিয়ে ইয়ার্কি মারল।

"না-না ওসব বেটি-ফেটি নয়। ছোটবেলায় পড়িসনি, আরে সেই যে টাং-টু-ইস্টারটা 'বেটি বটার বট সাম বাটার' ওরকম মেয়ে সারাজীবন খালি মাখনই কিনবে। একটা বেশ ব্রাইট লাইভলি-ডিসেন্ট মেয়ে দে। আছে চেনাশোনা?" প্রদীপ তার জ্যাঠাসুলভ ভঙ্গিতে খুব সিরিয়াস গলায় জিগ্যেস করল।

"একদম জ্যাঠামো করবি না!" খেঁকিয়ে উঠল শুভ্র, "আমার বিয়ের জন্য তোকে ভাবতে হবে না উল্লুক! নিজে একটা মেয়ে জোগাড় করে তাকে মাঝরাতে জাগিয়ে কবিতা শোনাস। আর ওই 'বেটি বটার...'-এর রাইমটা দিয়ে একদম মাটি করে দিলি। তোর উচিত ছিল বাংলা সিনেমার ভাঁড়ের রোল করা!"

"তার মানে তুই বেটিকে ভালবেসে ফেলেছিস!" বিরাট আবিষ্কার করেছে এমন ভঙ্গিতে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল প্রদীপ।

"কী!" কথাটা প্রদীপ বলছে বিশ্বাসই করতে পারল না শুভ্র।

"হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই! নাহলে ব্যাপারটা, মানে বেটির মাখন কেনার ব্যাপারটা তোর এরকম লাগবে কেন?" প্রদীপ এবার দাঁড়িয়ে—উত্তেজিত।

"এ শালাকে নিয়ে পারা যাবে না" হাল ছাড়ার ভঙ্গিতে বলল শুভ্র।

ত্বিষা হাসছিল ওদের কথাবার্তা শুনে। বাথরুমের দরজায় খুট করে শব্দ হল। ঋদ্ধি বেরিয়ে এল। ওরা কথা বলছিল, শুনতে পায়নি শব্দটা। ত্বিষা বসেছিল খাটে—ঠিক উল্টোদিকে ঋদ্ধি। তাদের চোখাচোখি হল। এক মুহূর্তের মধ্যেই ঋদ্ধির চোখে এক বিরাট শূন্যতা দেখল ত্বিষা। সে বুঝল না তার চোখ দুটো কেমন দেখাল ঋদ্ধির কাছে।

কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গেই ঋদ্ধি শিস দিতে আরম্ভ করল। ওরা দু-জন পেছন ফিরে তাকাল। ঋদ্ধি শিস থামিয়ে বলল "বাথরুম থেকে তোদের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। হোয়াৎস দ্য প্রবলেম?"

উত্তর দিল ত্বিষাই। "ওরা দু-জন দুজনের বিয়ে দিতে চাইছে।"

"গুড! বিয়ে করে ফেল—ইৎস আ গুড রিক্রিয়েশান!" আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল ঋদ্ধি। এখন সে একটা পাজামা পরে আছে—খালি গা। ঋদ্ধির দিকে তাকিয়ে হঠাৎই বুক মোচড় দিয়ে উঠল ত্বিষার।

"তুই আর বকিস না—এক বিয়েতে সাড়ে তিন মাস নিখোঁজ! আমরা তো সারাজীবনের জন্যে গায়েব হয়ে যাব রে—" হাসতে হাসতে বলল প্রদীপ।

ঋদ্ধির প্রতিক্রিয়া কেউ আশা করেনি। সে হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। চিরুনি

থেমে গেল চুলে। এক মুহূর্ত আয়নায় নিজেকে দেখল সে। তারপর বলল, "আমিও তো গায়েব হতেই চেয়েছিলাম।"

ঘর জুড়ে নিস্তব্ধতা নেমে এল। ত্বিষা ঋদ্ধির দিকে তাকাল। আয়নায় তার মুখ দেখল ঋদ্ধি। কিন্তু তার মুখের একটা রেখাও বদলাল না। সে একই রকম ঠাণ্ডা স্বরে বলল—"মানি—মানি ওয়জ দ্য থিং...!" আর কিছু না বলে চুল আঁচড়ানো শেষ করল ঋদ্ধি। তারপর বলল—"চল্, খেয়ে আসি। খুব খিদে পেয়েছে।"

ওরা উঠল। প্রদীপ ভীষণ অপ্রস্তুত। সে নানাভাবে কথা চালাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সুতোটা ছিঁড়ে গিয়েছিল।

খাওয়া হল একরকম চুপচাপ। ডাইনিং হলটা বেশ বড়। চারপাশে তারের জালি দেওয়া। বাইরে কয়েকটা গাছ—ঠিক পুকুরের গা ঘেঁষে। প্রকৃতি থেকে রাতের বৃষ্টির সব চিহ্ন মুছে যাচ্ছে।

খাবার সময় ঋদ্ধিকে বারবার দেখছিল ত্বিষা। খুব গম্ভীর ঋদ্ধি। প্রায় অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে খেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছে বাইরে—যেখানে গাছগুলো এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খাওয়া শেষ হতে হতেই শুভ্র বলল, "আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। চল দীপ এখন কাটি। সন্ধেবেলা আবার আসব। তোরাও রেস্ট নে।"

ত্বিষা ম্লান হেসে ঘাড় নাড়ল। ঋদ্ধি অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়ল। কিছু বলল না।

রাস্তায় বেরিয়ে প্রদীপ চাপাস্বরে বলল "আমি একটা ইডিয়েট।"

শুভ্র পেছন ফিরে তাকাল গেস্ট হাউসের দিকে। তারপর চিন্তিত গলায় বলল "কোনো একটা বড় কিছু ঘটেছে দীপ। আমরা কিছুই জানি না।"

ওরা এগিয়ে চলল। চারপাশে পড়ে রইল দুপুর আর গাছগাছালি।

ওরা দুজন শুয়েছিল খাটে। দরজা-জানালা সব ভেজানো থাকায় ঘরটা আবছা অন্ধকার দেখাচ্ছিল। ঋদ্ধি চিৎ হয়ে শুয়ে সিলিং দেখছে। ত্বিষাও দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে কিছু ভাবছিল।

প্রায় পনের মিনিট হল ওরা খেয়ে ফিরেছে। এতক্ষণ কোনো কথাই হয়নি। ঋদ্ধি খুব গম্ভীর আর অন্যমনস্ক, ত্বিষা চিন্তিত।

ঋদ্ধির দিকে পাশ ফিরল ত্বিষা। তার বুকে একটা হাত রেখে বলল "ওদের সামনে ব্যাপারটা কি ঠিক হল?" খুব আলতো স্বরে কথাটা বলল সে।

"আমার আর অ্যাক্টিং ভালো লাগছে না!" চাপা কিন্তু কাটা কাটা কথাগুলো বলল ঋদ্ধি ত্বিষার দিকে না তাকিয়েই।

"তুমি আমার সঙ্গে অ্যাকটিং করছিলে ঋদ্ধি?" ত্বিষা এক হাত দিয়ে ঋদ্ধির মুখটা ঘোরাল তার দিকে।

ঋদ্ধি স্পষ্ট করে তার চোখের দিকে তাকাল, "তুমিও কি তাই করছিলে না?"

"না ঋদ্ধি না! আমি সাড়ে তিন মাস পরে তোমায় পেয়েছি। আমি কোনো অভিনয় করছিলাম না। আর কিছু ভাবছি না এখন—আমি খালি তোমায় ভালবাসছি ঋদ্ধি...বিশ্বাস করো আমাকে!"

ত্বিষার ব্যাকুলতা ঋদ্ধিকেও যেন স্পর্শ করল। সে বলল "বিশ্বাস করছি তিষ্টি।"

ধীরে ধীরে দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছিল বিকেলের দিকে। তারা পরস্পরকে দেখছিল। কিন্তু বুঝতে পারছিল না কিছুই।

৮

শুভ্র ঘুম থেকে উঠেছিল সন্ধেবেলা। ঘুমটা একটু বেশি হয়ে গেছে তার। উঠে সে প্রদীপকে পাশে দেখতে পেল না। তাকাল জানালার দিকে। বাইরে অন্ধকার। ভাবল, মেঘ করেছে। আরো কিছুক্ষণ আলসেমি করে উঠল সে। ঘরের আলো জ্বালাল। ঘড়িতে দেখল সাড়ে ছটা বাজে। প্রথমে বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে সে প্রায় চারঘণ্টা ঘুমিয়েছে। বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিল শুভ্র। আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কেটে গেল। ঘরে ঢুকে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে বিছানায় বসল।

প্রদীপ নিশ্চয় আরো আগে উঠেছে। শুভ্রকে অঘোরে ঘুমোতে দেখে বিরক্ত না করে কোথাও গেছে। 'বেরোতে হবে"—ভাবল শুভ্র। কিন্তু গন্তব্যস্থলের কথা মনে পড়তেই ঋদ্ধির সকালের ব্যবহার মনে পড়ল তার। "তবু যেতে হবে। আর কী করব?" এই ভেবে উঠে পোশাক বদলাতে লাগল সে।

ফিরে এসে ওদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি। ঋদ্ধি-ত্বিষার সমস্যাটা ওদের ছুঁয়েছিল। শুভ্র একবার প্রদীপকে জিগ্যেস করেছিল ওদের সমস্যাটা কী তা সে জানে কি না। প্রদীপ অসহায়ভাবে ঘাড় নেড়েছিল একবার। তারপর আবার সব চুপচাপ। প্রদীপ গতকালের খবরের কাগজটা পড়ছিল। শুভ্র অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত মনে টেনে নিয়েছিল জ্যাক হিগিন্‌স-এর একটা বই —"দি ইগ্‌ল হ্যাজ

ব্ল্যাণ্ডেড।" কিছুক্ষণ চোখ বোলাতেই ঘুম পেয়ে গিয়েছিল তার। ঘুমের প্রাথমিক অবস্থায় কোনো একটা সময় সে লক্ষ করেছিল চেয়ার ছেড়ে প্রদীপ বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

পোশাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়াল সে। কেমন দেখাচ্ছে তাকে? "মন্দ নয়।" মনে মনে বলল শুভ্র: পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চির বলিষ্ঠ চেহারা। চওড়া কাঁধ, হাতদুটো বড় কর্কশ, মোটা আঙুল। অ্যালকোহলিক ফ্যাট জমেছে কিছু—গালে, চোখের নিচে। মুখের বাঁ পাশে দুটো ব্রণ, একটু মোটা আর চওড়া নাক। বৈশিষ্ট্য-হীন মাঝারি ধরনের চোখ। সব মিলিয়ে সে বেশ পুরুষ-পুরুষ দেখতে। "সাবাশ শুয়োরের বাচ্চা! চোস্ত কেরিয়ারিস্ট তৈরি হয়েছ তুমি—ম্যান অ্যাণ্ড মেশিন ইভ্‌নলি ব্লেণ্ডেড!" চাপা গলায় নিজের প্রতিবিম্বকে বলল শুভ্র।

দরজায় শব্দ। একপেশে হয়ে ঢুকল প্রদীপ। দু হাতে দুটো চায়ের কাপ। সত্যি, এই সময় এই চা টার বড় দরকার ছিল।

"পেছন ফের! সপাটে একটা ধন্যবাদ জানাই!" বেশ জোরেই বলে উঠল সে।

প্রদীপ কিন্তু অন্যমনস্ক। তার মানে ও ব্যাপারটা নিয়ে এখনও খুব চিন্তিত। ওকে সব কিছু বড় বেশি ছোঁয়! শুভ্র চায়ের কাপ নিতে হাত বাড়াল।

"কখন উঠেছিস তুই?" শুভ্র চায়ে চুমুক দিয়ে জিগ্যেস করল।

"বেশ কিছুক্ষণ আগে, বিকেলে। উঠে কিছুক্ষণ বারান্দায় বসলাম। তারপর ক্যান্টিনে গিয়ে এক কাপ চা খেলাম, একটু ঘুরলাম ক্যাম্পাসের এদিক-ওদিক। কিন্তু লোকজন বড্ড বেশি তাকাচ্ছিল। তাই আবার ক্যান্টিনে এসে..." প্রদীপ থেমে একটা সিগারেট ধরাল।

"দারুণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! অনেকদিন পরে, বিশ্বাস কর। এখনও কেমন একটা গদগদে ফিলিং হচ্ছে মাথায়!"

"আমিও ঘুমিয়েছি। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক।" প্রদীপ বলল।

সব চুপচাপ কিছুক্ষণের জন্যে। হঠাৎ প্রদীপ থেমে থেমে খুব ধীর গলায় বলল "শুভ্র, তুই কলকাতায় চলে আয়।"

শুভ্র কিছু বলল না। শুধু তাকাল প্রদীপের দিকে।

"এই চাকরিটা ছেড়ে দে। যা খুশি কর, কিন্তু এখান থেকে চল। নাহলে একদিন তুই পাগল হয়ে যাবি!"

শুভ্র চায়ের কাপটা ধীরে সুস্থে নামিয়ে রাখল। তার ভেতরে—খুব গভীরে কোনো একটা কষ্ট হচ্ছিল। "যাব। ঠিক চলে যাব একদিন।" শুভ্র প্রায় আপনমনেই বলল।

"চল বেরোই।" প্রদীপ বলল।

"হ্যাঁ...চল্" চায়ের কাপ দুটো হাতে নিয়ে উঠল শুভ্র। তারপর কী মনে পড়ায় প্রদীপের দিকে ও-দুটো বাড়িয়ে দিল "ধর।"

প্রদীপ হাত বাড়িয়ে নিল কাপ দুটো। শুভ্র ওয়ারড্রোব খুলে একটা রামের বোতল বের করল। কাগজের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল সেটা। তারপর প্রদীপের পেছন পেছন বেরোল।

ক্যান্টিনে চায়ের কাপ দুটো রেখে তারা রাস্তায় নামল। বেশ ঠাণ্ডা আজ। চারদিকে দৃশ্যের কোনো পরিবর্তন নেই। আজ বড় চুপচাপ গেস্ট হাউস পর্যন্ত পথটা পেরোল তারা।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। নক্ করার আগের মুহূর্তে প্রদীপ আর শুভ্রর চোখাচোখি হল। শুভ্র নক্ করল। ভেতরে একটা খস-খস শব্দ। একটু পরেই ত্বিষা দরজা খুলে দিল।

"আয়" বলে পিছিয়ে গিয়ে খাটে বসল সে। ঋদ্ধি শুয়েছিল। ওদের দেখে উঠে বসল। হাসিমুখে বলল "ভেবেছিলাম আরো আগে আসবি।"

"আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু শুভ্র মড়ার মতো ঘুমোচ্ছিল।" প্রদীপ বসল।

"তোরা চা খেয়েছিস?" শুভ্র জিগ্যেস করল।

"হ্যাঁ" ত্বিষা বলল "একটু আগেই চৌকিদার দিয়ে গেল। আর একবার বলি?"

"আমরা এখন আর খাব না। তবে চৌকিদারকে ডাকতে হবে। অন্য দরকার আছে।" বলে উঠল শুভ্র। রামের বোতলটা বের করে খাটে রাখল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"তোরা ক-দিন থাকবি কিছু ঠিক করলি?" খাটে পা ছড়িয়ে বসতে বসতে প্রদীপ জিগ্যেস করল।

"হ্যাঁ, ঠিক করেছি। কাল ফিরে যাচ্ছি!" ঋদ্ধি বলল। সে খুব মন দিয়ে রামের বোতলটা দেখছিল।

"কলকাতায়?" প্রদীপ ত্বিষার দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ—আর কোথায়? রাতের ট্রেনে ফিরব। টিকিটের তো বিশেষ ঝামেলা হয় না এখান থেকে যেতে।" এবার উত্তর দিল ত্বিষা।

"আমি ফিরে গিয়ে দেখা করব।" প্রদীপ বলল।

ত্বিষা শুধু একবার হাসিমুখে তাকাল। ঋদ্ধি "বাট অফ কর্স" বলে চোখ তুলল। আবার চোখ নামিয়ে নিল।

শুভ্রর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল চৌকিদার। খাটের ওপর কাগজ পেতে দিল সে। চারটে কাঁচের গ্লাস আর দুটো ঠাণ্ডা জলের বোতল রাখল।

শুভ্র খুব গুছিয়ে সবার জন্য মদ ঢালল। জল ভরল। তারপর ঋদ্ধিকে একটা গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল "তোরা নিশ্চয় আরো কদিন থাকছিস?"

ত্বিষা বলল "না। আমরা কাল রাতের ট্রেনে ফিরব। বিকেলের মধ্যেই পিকনিক স্পট থেকে ফিরে আসতে পারব না?"

"হ্যাঁ পারব। তাহলে আমি আজই তোদের টিকিটের ব্যবস্থা করে রাখি—কী বল্?" শুভ্র ত্বিষা আর প্রদীপকে দুটো গ্লাস এগিয়ে দিল।

"তোকে কিছু করতে হবে না। এমনিতেই তোকে অনেক ট্রাবল দিয়েছি।" ত্বিষাই বলল।

"আমি আর কী করছি? আমাদের বেয়ারা সন্তোষকে বলে দেব কাল এক ফাঁকে স্টেশানে গিয়ে টিকিটগুলো কেটে আনতে, পারলে রিজার্ভেশান করিয়ে নিতে। রিজার্ভেশান না হলে অবশ্য কোনো প্রবলেম নেই, চেকারকে গোটা দশেক টাকা দিলেই.."—নিজের গ্লাসে চুমুক দিল শুভ্র।

এরপর কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা হল। ঋদ্ধিও কথা বলল, সকালের তুলনায় স্বাভাবিক। তবে কম কথা বলছিল।

ত্বিষা এক পেগের বেশি খেল না। প্রদীপ দু-পেগ খেয়েই যথারীতি বালিশে ঠেস দিল। ঋদ্ধি খাচ্ছিল—শুভ্রর সঙ্গে তাল মিলিয়েই।

কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা বলার পর ঋদ্ধি হঠাৎ শুভ্রকে বলল "আচ্ছা শুভ্র কাউকে ভালবাসলে তার জন্যে কতটা করা যায়?" তার কণ্ঠস্বরে অল্প জড়তা ছিল কিন্তু মাতলামোর লক্ষণ ছিল না।

"আয়্যম ইন নো পোজিশান টু মেক আ কোমেন্ট অন দ্যাট।" শুভ্র হাসিমুখে বলল।

"কেন, তুই তো একসময় ত্বিষাকে ভালবাসতিস!"

এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। ত্বিষা নিস্পন্দ। প্রদীপ সোজা হয়ে বসল। শুভ্র একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঋদ্ধির দিকে। ঋদ্ধির চাহনিও অপলক, খালি তার চোখদুটো একটু বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

কিছুক্ষণ এভাবে কেটে গেল। শুভ্র একসময় বলল, "হ্যাঁ, আমি ভালবাসতাম।

কিন্তু ত্বিষা ভালবাসতো তোকে, আমাকে নয়।' নিজের গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিল শুভ্র। ঋদ্ধি তাকিয়ে ছিল। শুভ্র বলে চলল—

"ঋদ্ধি, তোদের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। এরকম ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর রুচিও আমার নেই। খালি একটা কথা তোকে বলা দরকার ঋদ্ধি—তুই অসুস্থ। এ-কদিন তোর ব্যবহারে আমার এটাই খালি বারবার মনে হয়েছে। আজ আমি কনভিন্সড।" শুভ্রকে চঞ্চল মনে হচ্ছিল। সে একবার ত্বিষার দিকে তাকাল। ত্বিষা এখনও যেন পুরো ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। সে তাকিয়ে আছে ঋদ্ধির দিকে।

"ত্বিষাকে আমি ভালবাসতাম—হ্যাঁ! কিন্তু যে ভালবাসা দু-জন মানুষের, তা আমার ছিলনা কোনোদিন, ছিল তোদের। তোর আজ ভাবতে অবাক লাগছে না ঋদ্ধি, তুই ত্বিষাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলি? ফ্যাক্টরি-তে কাজ করে করে আমি ভোঁতা হয়ে গেছি ঋদ্ধি, হয়তো তাই বুঝতে পারিনা তোদের। তবে, আই মাস্ট অ্যাডমিট, আমি তোর মতো হতেও চাই না।

"টু সাম আপ দ্য হোল থিং, ঋদ্ধি, আমি জানি না, ভালবাসা ব্যাপারটা কী? তাই ভালবেসে কিছু করা-না-করা ছাড়া-না-ছাড়ার ব্যাপারটা নিয়েও আমি ভেবে দেখিনি কোনোদিন। তোরা ভালো থাকলে আমি খুশি হব।"

শুভ্র তার গ্লাস শেষ করল। বোতলে আর সামান্য মদই অবশিষ্ট ছিল। সবটুকু নিজের গ্লাসে ঢালল। জল ফুরিয়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে আর মাথাও ঘামাল না শুভ্র।

ঋদ্ধি উঠে বসল। একেবারে দৃঢ় পায়ে খাট থেকে নামল সে। ঘরের ঠিক মাঝখানে এখন ঋদ্ধি, অন্য সবাই খাটের ওপর। যেন কোনো একক অভিনয় দেখছে।

"আমার দিকে তাকা শুভ্র। তুই একসময় ত্বিষাকে ভালবাসতিস, তুই বুঝবি। দ্যাখ আমার এই সুস্থ স্বাভাবিক শরীরটা, আয়ম হ্যান্‌সাম—এইন্ট আই? কিন্তু ভাব একবার—আমার ভেতরটা আসলে ঝুরো, এ্যরিড। আই অ্যাম নো লংগার আ ম্যান, বিয়িং ড্রায়েড আপ ফ্রম ইনসাইড। আয়ম আ ভেজিটেবল!"

ঋদ্ধি এগিয়ে এসে শুভ্রর সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল: "ত্বিষা কি আমাকে আর ভালবাসতে পারবে শুভ্র? আমায় ভাল করে দ্যাখ, আমার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা কর! আমি ত্বিষাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম বলে—এখনও ভালবাসি বলে—বলছি। আমি ইমপোটেন্ট—ফর লাইফ। তোর কি মনে হয় ত্বিষা আমায় সারাজীবন ভালবাসতে পারবে?"

ধীরে ধীরে ঋদ্ধির কথা জড়িয়ে আসছিল : "আই হ্যাভ আ স্ট্রং ফিজিকাল অ্যাট্রাকশন ফর হার, অ্যাণ্ড আই মাস্ট সে—" সোজা হয়ে দাঁড়াল ঋদ্ধি, অল্প টলছে সে, চোখগুলো বেশি উজ্জল।

"অ্যাণ্ড আই মাস্ট সে শি'জ রিয়ালি গুড ইন বেড! একসেলেণ্ট! —দ্যাংস দ্য ওয়ার্ড!"

টলতে টলতেই দেয়ালে হেলান দিল ঋদ্ধি। খুব ক্লান্ত, বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরে বলল, "বাট উইথ মি দ্যাট পার্ট উইল রিমেন ডেড। দ্য ফিজিকাল থিং ইজ ডেড। এর বাইরে যে মেণ্টাল এগ্রিমেণ্ট আছে আমাদের তা কি সারাজীবন একসঙ্গে থাকার জন্য যথেষ্ট? আই ডোণ্ট নো...।"

খাঁচায় গিনিপিগের অস্বস্তিতে কুঁকড়ে যাচ্ছিল ত্বিষা। তার মনে হচ্ছিল, শুভ্র আর প্রদীপের সামনে ঋদ্ধি তার নিজের এবং ত্বিষার পোশাক একের পর এক খুলে চলেছে। লজ্জা আর ঘৃণায় বোবা হয়ে ছিল ত্বিষা। কারো দিকে তাকাতে পারছিল না।

"দিস ইজ কিওরেবল—তুই যা বলছিস তা যদি সত্যিও হয়, তবু, দিস ইজ কিওরেবল।"—দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলল শুভ্র।

"কিওরেবল! সেরে যাবে!—বল্‌স! বল্‌স! বল্‌স টু ইয়ু ডক্টর! বাট মাইন উইল নট কিওর। আয়ভ কনসাণ্টেড দ্য মোস্ট রেপিউটেড ফিজিশিয়ানস অ্যাণ্ড সাইকায়াট্রিস্টস অব ক্যালকাটা, বাট মাইন উইল নট কিওর!"

শুভ্রর পাশে এসে বসল ঋদ্ধি। দুহাত দিয়ে শুভ্রর একটা হাত চেপে ধরল, খুব অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল "তুই ত্বিষাকে বিয়ে কর শুভ্র—অ্যাট লিস্ট ইয়ু স্টে উইথ হার। শি ইজ গ্রেট অ্যাজ আ ওয়াইফ, অ্যাজ আ উওম্যান। শি ইজ ননপেরেল। তাছাড়া তুই ওকে স্যাটিসফাই করতে পারবি। আই এন্‌ভি ইয়ু বাগার! বাট প্লিজ, ডু ম্যারি হার!"

এই সময়ে ত্বিষা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো উঠে ছুটে গেল বাথরুমে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

এদিকে ঋদ্ধির হাতদুটো ক্রমাগত শক্ত হয়ে চেপে বসছিল শুভ্রর হাতেব ওপর। প্রায় ছেলেমানুষী আবদারের স্বরে ঋদ্ধি বলছিল—"তুই একসময় তো ওকে ভালবাসতিস শুভ্র—প্লিজ..."

বেশ গায়ের জোর খাটিয়ে উঠে এল শুভ্র। দাঁড়াল। প্রদীপকে বলল "চল্—", তারপর খাটে বসে থাকা ঋদ্ধিকে বলল "নো মোর অব ইয়োর ইনস্যানিটি

ঋদ্ধি—আমরা যাচ্ছি। কাল ভোরে আসব। আমি এখন পুরো ব্যাপারটা ভুলে যেতে চাই। কাল সকালে দেখা হবে ঋদ্ধি, নো মোর অব দিস ..”

বেশ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে যেতে একবার বাথরুমের দিকে তাকাল শুভ্র। বন্ধ দরজার ওপারে ভেঙে-যাওয়া ত্বিষার মূর্তিটা যেন দেখতে পেল। তার কিছুই করার ছিল না। সে বেরিয়ে গেল।

প্রদীপ কী করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। সে শুধু একবার ঋদ্ধিকে বলল—“চলি ঋদ্ধি।”—ঋদ্ধি উঠে দাঁড়াল। ঘাড় নাড়ল। তারপর প্রদীপ বেরিয়ে গেলে, দরজা বন্ধ করে খাটে এসে বসল।

ঘড়ি তুলে সময় দেখতে ইচ্ছে করছে না কারো। তবে বেশ রাত এখন। গোটা ক্যাম্পাসে দূরে দূরে টিউবের আলো। আকাশে জ্বলছে তারা। নেশাগ্রস্ত চোখ সেদিকে আটকে যেতে চায়। কিন্তু আজ সকাল থেকে এ-পথটা দীর্ঘতর হয়েছে। তারা দুজনে নিঃশব্দে যাচ্ছিল। প্রদীপ ভাবছিল—স্বভাবতই ঋদ্ধির কথা। আর অদ্ভুতভাবে ঋদ্ধির শরীরটা নগ্ন হয়ে ভেসে উঠছিল তার চোখের সামনে। কেবলই তার মনে হচ্ছিল, যেন ঋদ্ধি অন্ধকার শীতের রাতে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তার জন্যে মন কেঁদে উঠল প্রদীপের। ঋদ্ধি সবার চেয়ে নিঃসঙ্গ।

দূরে ক্লাবে আলো জ্বলছে। দ্রুত বিটের কোনো মিউজিক চলছে ভেতরে। মনে মনে সেখানে অনেক রঙিন মানুষদের দেখতে পেল প্রদীপ।

কিছুদূর এসে সব চুপচাপ। খালি রাস্তায় তাদের জুতোর আওয়াজ। প্রদীপের কেন জানি গা-টা শিউরে উঠল। সে শুভ্রকে বলল “কী ভাবছিস শুভ্র?”

শুভ্র মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছিল। দু-হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। সে কেমন এক অদ্ভুত গলায় বলে উঠল—“আমি কলকাতায় যাব দীপ। ওখানেই থাকব।”

আরো কিছুক্ষণ পা-পড়ার শব্দ। শুভ্র যেন আবার নিজেকেই বলে উঠল “আমি বিয়ে করব। আই ওয়ন্ট টু নো হাউ আ উওম্যান লাভস”।

খুব অস্বস্তি হচ্ছিল ত্বিষার, কেমন একটা গা শিরশিরে অনুভূতি। বারেবারেই মনে হচ্ছিল দম বন্ধ হয়ে আসছে। অবশেষে সে চোখ মেলল।

ঋদ্ধি উবু হয়ে বসে আছে তার পাশে। একফাঁকে সে কখন যেন খুলে ফেলেছে

ত্বিষার ব্লাউজের বোতামগুলো। এখন ব্রাসিয়ার-এর স্ট্র্যাপ খোলার চেষ্টা করছে। অন্ধকার ঘরে তার মুখের আভাস খালি পাওয়া যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ।

রাতে তারা কেউই খায়নি। বাথরুম থেকে এসে এক ফাঁকে শুয়ে পড়েছিল ত্বিষা। ঋদ্ধি খাটের এক কোণে বসেছিল জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।

এরমধ্যে কখন যে ঋদ্ধি ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়েছে—ত্বিষা জানে না। রাতে সে আর পোশাক বদলায়নি। ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন যেন।

এখন—এত রাতে ঋদ্ধিকে খুব ভয় পেল সে। ফিসফিসে স্বরে বলল "একি!" ঋদ্ধি কোনো উত্তর না দিয়ে তাকে নিজের দিকে পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিল। এক মুহূর্তে খুলে দিল স্ট্র্যাপটা। কিছুক্ষণের মধ্যে ত্বিষাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ফেলল সে। ত্বিষা একবার শুধু বলেছিল "না ঋদ্ধি, প্লিজ, না!"

ঋদ্ধি কেমন এক হিসহিসে গলায় বলে উঠল "আমি পারব ত্বিষা।"

এরপরের অনুভূতি ভারি যন্ত্রণার। ঋদ্ধি তাকে যেন খেতে লাগল। ত্বিষা বুঝতে পারছিল তার বুকে ঋদ্ধির দাঁত গভীরভাবে বসে যাচ্ছে, হাত দুটো নখ দিয়ে আঁচড়ে দিচ্ছে ঋদ্ধি। তারপর কখন যেন সে একটা হাত নামিয়ে দিল ত্বিষার তলপেটেরও নিচে।

বিভিন্ন সময় যন্ত্রণায় চাপা চিৎকার করছিল ত্বিষা। থামানোরও চেষ্টা করছিল তাকে। কিন্তু পারেনি। সে বুঝতে পারছিল তার ঋদ্ধি তাকে রেপ করছে। সেই ঋদ্ধি যে আর পুরুষ নয়। ত্বিষার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ বিদ্রোহ করছিল। ঋদ্ধি তাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিচ্ছিল। তার চাপা চিৎকারে ঋদ্ধির উৎসাহ যেন বেড়েই চলছিল ক্রমাগত। শেষে একসময় ত্বিষা বুঝতে পারছিল সে আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবে না।

কিন্তু হঠাৎই একসময় সব শেষ হয়ে গেল কিছুই হল না। ঋদ্ধির হাঁফানোর শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল ত্বিষার শরীরে তার হাত-দাঁত-নখের ঘোরা-ফেরা। গোঙাতে লাগল ঋদ্ধি। বন্য জন্তুর মতো গোঙাতে লাগল সে।

কলকাতা থেকে বহুদূরে এক পাহাড়ি জায়গার অন্ধকার গেস্ট হাউসের ঘরে রক্তাক্ত শরীরে শুয়ে ত্বিষা তার নপুংসক স্বামীর গোঙানি শুনতে লাগল।

৯

গুনে গুনে ঠিক তিনবার হর্ন বাজাল শুভ্র। এখনও চারদিকে আলো ফোটেনি।

এমন এক সুন্দর ভোরে হর্নের শব্দ বেশি কর্কশ শোনাল। তবু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না ঋদ্ধি-ত্বিষার। শুধু শ্যামসুন্দরজীর কাশির শব্দ পাওয়া গেল। বুড়ো মর্নিং ওয়কে বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে ছেলের জন্যে অপেক্ষা করছ।

শুভ্র ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে জিপ থেকে নামল। প্রদীপও নামল তার পেছন পেছন। তারা এগিয়ে চলল গেস্ট হাউসের দিকে।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি কারো। দু-জনেই চিন্তিত ছিল। একসময় নেশার জন্যেই হয়তো বা একটু তন্দ্রামতো এসেছিল প্রদীপের। কিন্তু নেশা কেটে যেতেই সেটাও উধাও হল। তারপর সে বাকি রাতটা ঠায় জেগেছিল। এ-ও বোঝা যাচ্ছিল যে শুভ্র জেগে আছে। কিন্তু কোনো কথা বলেনি তারা। শেষে ভোরবেলা যখন চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে, তখনই জিপ এসে দাঁড়াল। দশ মিনিটের মধ্যেই দু-জনে বেরিয়ে পড়ল তৈরি হয়ে। খাবারদাবার শুভ্র রাতেই ক্যান্টিন থেকে নিয়ে নিয়েছিল।

চার নম্বর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। কী আশ্চর্য! এত আওয়াজেও ঘুম ভাঙেনি ওদের। শুভ্রর ব্যাপারটা ভালো লাগল না। সে সোজা গিয়ে নক্ করল দরজায়। ঘরের ভেতরে খুট করে সুইচ টেপার শব্দ হল।

একটু পরেই দরজা খুলে দিল ত্বিষা। তার পোশাকের ধরন দেখে বোঝা গেল সে একেবারেই তৈরি হয়নি। দোমড়ানো-কোঁচকানো একটা শাড়ি পরে আছে সে। চোখ লাল, চুল এলোমেলো। টিউবের স্বচ্ছ আলোয় এই ত্বিষাকে দেখেই কেন যেন তারা একটু ভয় পেল। তবু গলায় স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে শুভ্র বলল :

"কী রে, একদম তৈরি হোসনি, ক-টা বাজে খেয়াল আছে?"

ত্বিষা বলল "ভেতরে আয়। কথা আছে।" বলে সে ভেতরে ঢুকল। খাটের এক কোণায় বসল।

তারা দুজনে ঢুকে খাটের অন্য দিকে পাশাপাশি বসল। প্রদীপ বলল, "ঋদ্ধি কি টয়লেটে···?"

ত্বিষা বলল, "না"।

উঠল সে। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ড্রেসিং টেবিলের দিকে। সেখানে তার পার্স দিয়ে চাপা দেওয়া ছিল এক টুকরো কাগজ। সেটা নিয়ে এল। এগিয়ে দিল ওদের দিকে।

"ত্বিষা..."—কাগজটা হাতে নিয়ে কিছু বলতে গিয়েছিল শুভ্র।

"ওটা পড়, বুঝতে পারবি।" ত্বিষা একই ভঙ্গিতে বলল। একই জায়গায় বসে।

শুভ্র ফুলস্ক্যাপ্ কাগজের অসমানভাবে ছেঁড়া অংশটা তুলে ধরল নিজের চোখের সামনে। প্রদীপও ঝুঁকে পড়ল সেদিকে।

মাত্র কয়েক লাইনের চিঠি। ঋদ্ধি লিখছে—"ত্বিষা, চললাম। আর আসব না। কিংবা হয়তো আসব, অনেকদিন পরে। এসে দেখব, তুমি কেমন আছ? তোমার পার্স থেকে কিছু টাকা নিলাম। তোমার অনেক কিছুই নিয়ে গেলাম ত্বিষা। আর তুমি আমায় খুঁজবে না। ভালবাসার কথা অন্য অনেকের মতো আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। ভালো থেকো। শুভ্র আর প্রদীপকে কাল ভোরে (নাকি আজ ভোরে?) চিঠিটা দেখিও। এখন তুমি ঘুমোচ্ছ, আমি ল্যাম্পের আলোয় এই চিঠি লিখছি। আবার, ভালো থেকো, সো লং। ঋদ্ধি।"

এক ঝটকা মেরে উঠল শুভ্র "চল্, এক্ষুনি বেরোতে হবে!"

ত্বিষা একই ভাবে বসে আছে। জিগ্যেস করল—"কোথায়?"

শুভ্র দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল "কোথায় মানে? ওকে খুঁজতে। ও পায়ে হেঁটে বেশিদূর যেতে পারবে না। আমাদের সঙ্গে জিপ আছে, ঠিক ধরে ফেলব ওকে!"

"তারপর?" খুব নিচু গলায় জিগ্যেস করল ত্বিষা।

শুভ্র থেমে গেল। দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হাল ছাড়ার মতো করে বসে পড়ল।

"কোনো লাভ নেই শুভ্র। তুই সত্যিই বুঝতে পারছিস না?" চিঠিটা শুভ্রর হাত থেকে নিয়ে মুড়তে মুড়তে ত্বিষা বলল।

শুভ্র চুপ করে বসে রইল। প্রদীপ বলল, "কিন্তু তাহলে—?"

ত্বিষা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমরা এখন পিকনিকে যাব। আমরা তিনজন। তোরা একটু গাড়িতে বোস। আমি চেঞ্জ করেই আসছি। দশ মিনিটের মধ্যে।"

শুভ্র এগিয়ে গেল। প্রদীপ কেমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ত্বিষা বলল "ছেলেমানুষী করিস না প্রদীপ—আমি এক্ষুনি আসছি।"

প্রদীপ বেরিয়ে এল। ত্বিষা দরজা বন্ধ করে দিল পেছন থেকে। নিচে নেমে জিপে এসে শুভ্রর পাশে দাঁড়াল প্রদীপ। তারা পরস্পরের দিকে তাকাল। তখনও ঠিক সকাল হয়নি, চারপাশ শুধু আরো পরিষ্কার হয়েছে। ড্রাইভার স্টিয়ারিং হুইলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। প্রদীপ চোখ সরিয়ে নিল শুভ্রর দিক থেকে। একটা সিগারেট ধরাল। পুকুরের ধারে একটা লোক কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে।

তখন বহু দূরে হয়তো কেউ একজন হেঁটে যাচ্ছে। স্টেশানের দিকে না, এমনকী নদীর দিকেও না; সে-একটা এঁকা-বেঁকা এলোমেলো মেঠো রাস্তা। লোকটা হেঁটে চলেছে মৃদুমন্থর গতিতে। সে জানে, আর কেউ তাকে খুঁজবে না।

অল্প অল্প বাতাস বইছে। অল্প শীতের বাতাস। সেই বাতাসে লোকটায় মাথার চুল উড়ছে একটা-দুটো। ডান দিকে দূরে পাহাড়। আর যে এঁলেবেলে রাস্তাটা দিয়ে সে হাঁটছে তা সামনের অনেকটা জায়গা জুড়েই একরকম।

এমন এক সকালে সবার কাছ থেকে সরে গিয়ে একলা হাঁটতে তার কেমন লাগছিল, কী ভাবছিল সে, তা আমাদের গল্পের মধ্যে পড়ে না।

এক্ষুনি জিপটা স্টার্ট নিল। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে শুভ্র। পেছনের সিটে প্রদীপ আর ত্বিষা। একটা ছিমছাম শাদা শাড়ি পরেছে ত্বিষা। খুব অল্প সেজেছে বরাবরের মতোই। একটা বেণীতে চুল বেঁধেছে। প্রদীপ মাঝেমধ্যে আড়চোখে তাকে দেখছে, কথা বলতে চাইছে, কিন্তু বলার মতো কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। শুভ্র স্থির হয়ে সোজা তাকিয়ে আছে। সিগারেট টানতে টানতে।

ক্যাম্পাস পার হয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে কালো পিচের রাস্তা ধরে। ঘুম ভেঙেছে অনেক মানুষের। অনেকে পথে বেরিয়ে পড়েছে। দূরে-দূরে একটা-দুটো বাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

কিন্তু ত্বিষা এসব কিছুই দেখছিল না। সে শুধু ভাবছিল শুভ্র বা প্রদীপ, এমনকী ঋদ্ধিও, কোনোদিন জানবে না যে কাল রাতে ঋদ্ধির চিঠি লেখা, সেটাকে সন্তর্পণে চাপা দেওয়া, পার্স থেকে টাকা বের করে নেওয়া—সবই ত্বিষা দেখেছিল। ঋদ্ধি পোশাক বদলে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তার কিছুক্ষণ পরেই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল ত্বিষা। এসব ওরা কেউ জানে না।

গাড়ি ছুটে চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। চারপাশে ক্রমাগত সরে-যাওয়া দৃশ্যপট দেখতে দেখতে ত্বিষা ঋদ্ধিকে বিদায় জানাল। এই তো ভালো। এভাবে—এত ভোরে—কেউ জেগে ওঠার আগে চলে যাওয়াই তো ভালো। বিদায়—ঋদ্ধি।